

📍 লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই : পৃষ্ঠা ৪
📍 অগ্নিকাণ্ডে মরছে মানুষ-দায় নিচ্ছে না কেউ! পৃষ্ঠা ৫
📍 গণমানুষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন চাই : পৃষ্ঠা ৮

📍 ১৫ বছরে ১৪ বার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি : জনগণের কাঁধে আর কত বোঝা চাপবে? : পৃষ্ঠা ১০
📍 দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাপন ব্যয় বাড়ছে : কী কাটবে আর কোনটা ছাঁটবে? : পৃষ্ঠা ১২
📍 খেলাপি ঋণ উদ্ধার, অর্থ পাচারকারীদের শ্রোতার ও শ্বেতপত্র প্রকাশ কর : পৃষ্ঠা ১৬

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আহ্বান—

নারীর মর্যাদা-অধিকার এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন



নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করা, শোষণ-লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, নির্যাতন রুখে দাঁড়ানো এবং সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই শক্তিশালী করার প্রত্যয় নিয়ে ৮ মার্চ ১১৪তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক

মহিলা ফোরামের উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এক বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ

সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জার্মানির এমএলপিডি এর চেয়ারউইম্যান কমরেড গাবি ফেচনার, অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ উইমেন্স এসোসিয়েশন এর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড চন্দ্রাখিতা চৌধুরী, অল নেপাল উইম্যান্স এসোসিয়েশন (রেভ্যুলিউশনারি)

শোষণ-নিপীড়ন রুখে দাঁড়ান

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শক্তিশালী করুন

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের নারী সমাবেশে নেতৃত্ব

এর সম্পাদকমণ্ডলী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এর সদস্য, নেপালের সাবেক গণপরিষদের সদস্য, কমরেড আং দাওয়া শেরপা, সোশ্যালিস্ট উইমেন্স ইউনিয়ন, শ্রীলঙ্কা এর সদস্য কমরেড বি আর কল্পনা মধুভাষিণী, করিমপুর চা-বাগানের শ্রমিক মুন্সিবাজার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলর কাজল রায়, কৃষক ও আদিবাসী নেত্রী আশিনি তিরকি, গার্মেন্টস শ্রমিকনেত্রী লিমা, গৃহশ্রমিক প্রতিনিধি জান্নাতুল ফেরদৌস। সমাবেশ পরিচালনা করেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ফ্যাসিবাদী ও দুর্বৃত্ত শাসন রুখে দাঁড়ান

দেশি-বিদেশি লুটেরাদের অনুগ্রহ নয়-জনগণের শক্তি গড়ে তুলুন

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্বাসিত গণতন্ত্রের দ্বাদশ ভোট উৎসব সমাপ্ত হয়েছে ৭ জানুয়ারি ২০২৪। এ এক অভূত উৎসব, যেখানে ভোট আছে ভোটার নেই। তাই আমি-ডামি, স্বনামি-বেনামি, ছদ্মবেশী, প্রলোভনে নাচুনি, খেল-তামাশার নামি-দামি ইত্যাদি জড়ো করে আসর জমানোর যে ছক কষা হয়েছিল, সেখানে ভোটার উপস্থিতি না হয়ে যেন পাতে জল ঢেলে দিয়েছে। ১০ ভাগ ভোটার উপস্থিতির হিসাব মেলানোও যেখানে কঠিন ছিল, সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২৮ ভাগ বলতে গিয়ে পাশ থেকে শোনা কথায় শেষ পর্যন্ত ৪১.৮ ভাগ ঘোষণা দিয়েছেন। কৌশল-অপকৌশলের আওয়ামী এই প্রক্রিয়ায় গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একভাবে শামিল করা হয়েছে। তাই ডিজিটাল সিস্টেমে পাশ-ফেলের সিগন্যাল যেখানে যেমন গেছে তার খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। এর মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীর ১৫ বছরের দখলি গদি পুনর্বীর রক্ষা করা গেছে। তবে গণতান্ত্রিক চেতনা-সংস্কৃতি, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের স্বাস্থ্যবোধ করা অবস্থার উপর আর

একটি কঠিন পাথর চাপা পড়লো। এই নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক দল ও তাদের সহযোগীরা টানা ১৫ বছরের পরও টিকে থাকার বাহাদুরি ও দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারা কৌশলে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিকে কুপোকাত করতে পারাসহ সকল বিরোধী শক্তিকে পর্যুদন্ত বা ঠেকিয়ে রাখার কৃতিত্বও দাবি করেছে। যে প্রসাদে যে দেবতা তুষ্ট হন, তেমন প্রসাদ বিতরণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দেবতাদের তুষ্ট করা গেছে। তারপরও অন্তরে অনিশ্চয়তার কালো মেঘের ছায়া দূর করতে পূর্ব-পশ্চিম গোলাধর্ষণে নীলাকাশ পর্যবেক্ষণে থাকতে হচ্ছে। তবে কথিত নির্বাচনও কৌশলে বিজয়ের সার্টিফিকেটধারীরা তাদের আখের গোছানোর কাজে বেপরোয়া গতিতে এগুচ্ছেন। কারণ বিগত দিনের হলফনামায় ধরা পড়া চুরি-দুর্নীতির দায়ে কাউকে জবাবদিহি করতে হয়নি, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তো দূরের কথা। ফলে কিছু পদ-পদবির অদলবদল ও বাজিমাত করা কথ বাবর্তায় জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও দুর্নীতি দমনের কাজে ফল হচ্ছে না। লুটপাটে অংশীদারের সংখ্যা

না কমে বরং বেড়েছে। ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। বাজার অস্থিতিশীল, দ্রব্যমূল্যের চাপে মানুষ দিশেহারা। ব্যাংক ব্যবস্থা, রিজার্ভ সংকট, বাণিজ্যিক সিডিকেট, টাকা পাচার, বিদেশি শক্তিসমূহের টানাটানি, রোহিঙ্গা বোঝার উপর মিয়ানমার যুদ্ধ পরিস্থিতির শাকের আঁটি, বেকারত্ব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, জাতির ভবিষ্যৎ কিশোরদের গ্যাং উপাধি লাভ, পরিবেশ বিপর্যয়, পাহাড়-নদী, সমতলভূমি, জলাভূমিতে দখল-দস্যুতা ইত্যাদির দায় ও সরকার পারলে বিরোধীদের উপর চাপায়।

কমপক্ষে আড়াইশ থেকে আড়াই হাজার শতাংশ পর্যন্ত সম্পদ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী পুরোনোরা এবং তাদের রেকর্ড ভাঙার মনোবাসনা নিয়ে নবীনরা সংসদকে অধিক কার্যকর করার কথা বলে চলেছেন। যে মানুষদের কাজে-কর্মে লাগাম টানা যায় না অর্থাৎ যাদের জবাবদিহিতা থাকে না, তাদের কথাবার্তায় দায়িত্বজ্ঞানের বদলে কথার ফুলঝুড়ি ও বাচাল বিতর্কের মনোযোগ বেশি থাকে। অনেক দিনের চর্চায়

এটা বদভ্যাসে পরিণত হয় এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে পছন্দসই বন্দনাগীত ও তার দৃষ্টি আকর্ষণকারী মনোমুগ্ধকর কথায় ও নিবেদনে যে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে তাতে নিঃসন্দেহ থাকা যায়। কারণ জনগণ এখানে শুধুই সাধারণ। আর এ অবস্থায় মধ্যবিত্ত বিশেষ করে এখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ আগে যেখানে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে অবস্থান নেয়া বা মতামত গঠনে, সাংস্কৃতিক জাগরণে ভূমিকা রাখতো তার বড় অংশই এখন বড় বুর্জোয়াদের নীচে নামানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। আওয়ামী লীগ যেমন তার একই শ্রেণিভুক্ত বিএনপিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিজের সকল অপকর্মের দায় সারছে, তেমনি অনেকটা এ সকল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত মানুষেরা যেন বামপন্থাকে প্রতিপক্ষ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বামপন্থার রাজনীতির অনেক ভুলভ্রান্তি অতীতে যেমন ছিল এখনও অনেক ভ্রান্তি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এই দুর্বলতা ঘাটতি এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দেশি-বিদেশি লুটেরাদের অনুগ্রহ নয়-জনগণের শক্তি গড়ে তুলুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কি মন্তব্যের তীর ছুড়ে দূর করা যাবে? বামপন্থার কিছু অংশ বুর্জোয়া শিবিরে প্রবেশ করে কী দশায় পড়েছে এবং বামপন্থার গায়ে কতটা কালিমা লেপন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও নীতিনিষ্ঠ বাম রাজনীতির সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে তা বলা চলে না। বুর্জোয়া ক্ষমতাসীনেরা পাকা বাম সব বেছে নিয়েছিল। এখন আবার তার পচা দুর্গন্ধ থেকে নিজেরা দূরত্বে থাকার জন্য তাদের খোলাই দূরস্ত করে ছাড়ছে। নানা পদপদবি ও সুযোগ-সুবিধা নেয়া বুদ্ধি বেচে খাওয়া বুদ্ধিজীবীরাও এ দশা থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। বামপন্থীদের নতুন করে ভাবতে হবে কথাটা ঠিক কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ-এটা তো মার্কসবাদের পুরোনো কথা। তাহলে নতুন পরিস্থিতিটা কী এবং বামপন্থার কর্তব্য করণীয়টাই বা কী সে সম্পর্কে কিছু মন্তব্য বা ভুল ভ্রান্তি ব্যর্থতার কিছু চিত্র হাজির করাই কি যথেষ্ট? সত্যিকার বামপন্থিরা সত্যের খোঁজে, নতুনত্বের সন্ধানে থাকে। কিন্তু বামপন্থা নিয়ে যে ধরনের সমালোচনা করা হচ্ছে, তাতে এর সন্ধান মিলে না। হয় কিছু মন্তব্য, বিষোদগার বা ব্যর্থতার ইতিহাসের চর্চিতচর্চণ না হয় এমন দুর্বোধ্য কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা যার আগামাখা পাওয়া ভার।

দেশের অর্থনীতির চিত্রটা একটু ভাবুন! দেড় কোটির উপর শ্রমজীবী মানুষ ভাগ্যের অন্বেষণে প্রবাসে, এদের আয়ের দিকে তাকিয়ে তাদের পরিবারের প্রায় ৫ কোটি মানুষ। মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশগামী। বিশ্বের সবচেয়ে কম মজুরি বাংলাদেশের শ্রমিকদের। এরা আর্থিক চাপে ও মান্তান-সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি দশায় পতিত। তার উপর দালাল শ্রমিক সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রতারণার শিকার। মজুরি আন্দোলনে আমাদের ৪ জন শ্রমিক শ্রমিক আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন। কারাবরণ ও আহত হওয়ার সংখ্যা অনেক। এটাও যথেষ্ট নয়। সকল বামপন্থীদের মিলিত শক্তিও এখন পর্যন্ত অপরিপূর্ণ। কৃষক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, নারী আন্দোলন, পেশাজীবীদের সংগঠিত আন্দোলন ইত্যাদির দুর্বল দশা সবার জানা। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দূরত্ব রক্ষা কি এ অবস্থা বদলানোর সহায়ক হবে?

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সংকট শুধু বাংলাদেশে নয়, এ বছর প্রায় ৬৪টি দেশে নির্বাচন হচ্ছে। এর

কোনটাই এককালের ঘোষিত আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী হবে না। মাত্রাগত তারতম্য হয়তো থাকবে। আমেরিকা ভারত থেকে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় মানুষ তা একভাবে বুঝেছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেহারা নিয়ে বিশ্লেষণ করে রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়ারা কয়েক বছর পর পর তাদের শ্রেণিভুক্ত কোন দল বা গোষ্ঠী জনগণের উপর শাসন-শোষণ চালাবে তার অনুমোদন নেয়ার নাম দিয়েছে নির্বাচন। তখনও পর্যন্ত জালজালিয়াতি, জবরদস্তি, নানা কলাকৌশলের কারসাজি ইত্যাদিকে জনগণের চোখের কিংবা বোধের আড়ালে, নাগালের বাইরে রাখার চেষ্টা বুর্জোয়ারা করতো। কিন্তু এখন ততটুকুও রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনসম্মুখে সব খোলামেলা হয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন এ হাল দশায় বুর্জোয়া পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া এসে দাঁড়ালো? মনীরী কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও কমরেড লেনিনের হুশিয়ারিকে গুরুত্ব না দিয়ে এর কুলকিনারা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বুর্জোয়া শ্রেণি যখন সামন্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন তারা রাজতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্রের ধারণা অর্থাৎ রাজার ক্ষমতার বিপরীতে জনতার ক্ষমতার কথা এনেছিল। ক্ষমতার উৎসকে দৈবশক্তির বদলে জনতার শক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সকল মানুষের মধ্যে সমতা, সমান মর্যাদা ও সমঅধিকারকে গণতন্ত্রের শর্ত বলেছিল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেই যে অর্থ ব্যবস্থা চালু করলো তা ছিল পুঁজিবাদী। অর্থাৎ মুনাফার অর্থনীতি। শোষণ ছাড়া মুনাফা হয় না। শোষণে অধিকারের মর্যাদার সমতা থাকে না। তাই মুনাফার হার যত বাড়ে জনতার অধিকার পাওয়ার হার তত কমে। শুরুতে পুঁজিবাদ ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে। অর্থাৎ সদ্য সামন্তব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য বেনিয়া বুর্জোয়াদের পুঁজির পরিমাণ ছিল কাছাকাছি। ফলে তাদেরকে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে মুনাফা লাভ করতে হতো। এ সময়টাকে বলা হয় লেজেফেয়ার বা অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ। ফলে বুর্জোয়া রাজনীতিটাও ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। অসংখ্য পুঁজিপতির প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে জনগণের মত-পথ বাছাই করার ও বাজারের দরদামে লাগাম টানার কিছুটা ক্ষমতা ছিল। কিন্তু উৎপাদনের উন্নতমানের কারিগরি হালহাতিয়ার যাদের হাতে

প্রথম এসে গেল সেই পুঁজিপতিদের উৎপাদন খরচ কমে গেল। ফলে বাজার থেকে পিছিয়ে পড়া পুঁজিপতিরা হটে যেতে থাকলো। এইভাবে বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করে একচেটিয়া করবারে আত্মপ্রকাশ করলো। মার্কস এই অবস্থা দেখে যাননি কিন্তু অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে এ পরিণতির ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন। ফলে অর্থনীতির চেহারায় যতই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বাজার নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ক্ষমতায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকলো, রাজনীতি ততই স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী চেহারার রূপ ধারণ করলো। এরপর লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছাল, তখন রাজনীতি ফ্যাসিবাদের চেহারায় আবির্ভূত হলো। পুঁজি, পণ্য বাজার নিয়ে লড়াই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ সেরে আঞ্চলিক-উপআঞ্চলিক যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দুনিয়াকে ফেলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক থেকেও মুক্ত রাখতে পারছে না। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতো সেভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পতনের পর তাও ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী, কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার শাসন ব্যবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই বাস্তবতার সঠিক উপলব্ধি ছাড়া গণতন্ত্র গেল গেল বলে হাহাকার বা হাপিতোশ করে লাভ হবে না।

শোষণ যত বাড়ে, বৈষম্য তত বাড়ে। বৈষম্য যত বাড়ে, জনগণ ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে তত দূরে ছিটকে পড়ে। ক্ষমতার মালিক জনগণ যত ক্ষমতা বলয়ের বাইরে নিষ্কণ্ট হতে থাকে, জনগণের সম্পদ লুট করা গোষ্ঠীর হাতে তত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন যত হতে থাকবে, জনগণ তত শুধুমাত্র সংখ্যা বা গণতন্ত্রের সাইনবোর্ডে পরিণত হয়। সংখ্যার হিসাবে থাকা এই জনগণ ভোটের সিল মারা কাজে যত ব্যবহৃত হতে থাকে তত রাষ্ট্রীয় প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আইন-বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভবান ক্ষমতামালীদেবের দিকে হেলে পড়ে। এই হেলে পড়া দশা স্বৈরশাসনের দ্বার উন্মোচন করে। জনগণের ঐক্যের শক্তি বিভক্ত ও খণ্ডিত হয়। ৯৯ ভাগ মানুষের সম্পদ ১ ভাগ মানুষের দিকে জমা হতে থাকে। এতে স্বাধীনতার মানচিত্র শুধুমাত্র সীমানা রেখায় রূপ লাভ করে। দেশীয় লুটেরা ও আন্তর্জাতিক লুটেরা গোষ্ঠীর মেল বন্ধন রচিত হয়। দুর্বল দেশের জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন দশায় পড়ে। গণতন্ত্র-মানবাধিকার পুঁজিবাজারের পণ্যে পরিণত হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার এই

সময়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সানতনী ধারণায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

এখন গণশাসনের জন্য জনগণকে ক্ষমতাবান করতে হবে। তা করতে হলে শোষণ ও বৈষম্যের চলতি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে নিয়ে যেতে হবে যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও গণআকাঙ্ক্ষা ছিল। পুঁজিপতিশ্রেণির শাসন ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কারণ, জনগণের হাতে সম্পদের মালিকানা যতভাগ আসবে ততভাগ গণশাসন কায়ম হবে। কয়েক বছর পর পর শুধু ভোটের মহড়া নয়, উৎপাদন-বিলবন্টন, শাসন-প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাকে উচ্চতর গণতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলা চলে। এটাই সময়ের দাবি।

অতীত ও বর্তমানের ব্যর্থতার উদাহরণ দেখিয়ে হতাশ হওয়া নয়, ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান, যুক্তিসংগতভাবে বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত করা এবং দূর করার নীতিনিষ্ঠ সংগ্রাম করে সংকটের সমাধান করতে হয়। বহু সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সঠিক চর্চার অভাবে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসসাধন কিংবা পুঁজিবাদের পথ অনুসরণের দৃষ্টান্ত হাজির না করে সঠিক সংগ্রামের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের গণতন্ত্রই পারে গণ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সাম্য সমাজে পৌঁছাতে। কিন্তু বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অবস্থা রাতারাতি অর্জন করা যাবে না। সংগ্রামের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। প্রথমে উপলব্ধিটা পরিষ্কার করতে হবে। বাম-প্রগতিশীল, উদারনৈতিক, দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক সকল শক্তির মিলিত আন্দোলনের শ্রোত রচনা করতে হবে। এ পথেই বুর্জোয়া বনাম বুর্জোয়া রাজনীতির বিকল্প বুর্জোয়া বনাম সর্বহারা মেহনতি জনতার রাজনীতি দাঁড়াবে। সেই পরিষ্কার শ্রেণি অবস্থান থেকে লড়াই-সংগ্রামের পথে সত্যিকার গণশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

আপাত ব্যর্থতায় হতাশা না হয়ে যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করা, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-জনতার ঐক্য গড়া এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই শক্তিশালী করাই এখন আমাদের সকল বামপন্থীদের প্রধান কাজ সেই পথেই এগিয়ে আসার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান জানাই।

বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধশত মানুষের মৃত্যু

ভবন মালিক-ব্যবহারকারীর বেপরোয়া মনোভাব ও সরকার-প্রশাসনের অবহেলাই দায়ী

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে বাম

জোটের নেতৃবৃন্দ

বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নেতৃবৃন্দ ১ মার্চ '২৪ বেইলি রোডে

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কথা বলেন।

স্থানীয় জনসাধারণ জানান, বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালেই দেখা যায় এই বিল্ডিংয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ বেরোনোর মতো উল্লেখযোগ্য কোনো

পথ নাই। দিনের বেলায়ও এই ভবনে বাতি না জ্বালালে সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করে।

জোটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অতীতে নিমতলী, চকবাজারের চুড়িহাটা, বনানী, বঙ্গবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পরই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় না। যদিও কোনো কমিটির পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়, সেই সুপারিশ বাস্তবায়নেও কোনো অগ্রগতি দেখিনি। অতীতের ঘটনায় যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে একের পর এক এই ধরনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মানুষের প্রাণ হারাতে হতো না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তথাকথিত উন্নয়ন এবং এই ধরনের সুরম্য ভবন তৈরি করলেও নিয়ম না মেনে এখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এজন্য ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের কর্মকর্তারাও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। নেতৃবৃন্দ তাদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান এবং নিহতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসাসহ ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

পরিদর্শনের সময় বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন খ্রিস্ট, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা সীমা দত্ত, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা শামীম ইমাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র প্রতিরোধ দিবস পালিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

১৪ ফেব্রুয়ারি '২৪ স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র প্রতিরোধ দিবস স্মরণে ছাত্র সমাবেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ স্থগিত, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-সম্প্রদায়িকীকরণ ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব বন্ধের দাবি জানানো হয়। ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যে সমাবেশ করে মিছিল কলা ভবন ঘুরে রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়মের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক জাভা এরশাদ সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি বাতিল এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। ওই কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে সেদিন এবং পরদিন নিহত হন জাফর, জয়নাল, কাঞ্চন, আইয়ুব, দীপালি সাহা, মোজাম্মেলসহ অনেকে। এর পর থেকে প্রতিবছর ওই দিনটিকে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। শহিদদের স্মরণে '৮৩ স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের উদ্যোগে শিক্ষা ভবনের সামনে নির্মিত 'শিক্ষা ও গণতন্ত্র স্মৃতিস্তম্ভ' ছাত্র ফ্রন্ট সকাল ৮টায় শ্রদ্ধাঞ্জলি



অর্পণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রসমাজের জীবনের বিনিময়ে এদেশে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। সামরিক জাভা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের শাসনামলে শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন ড. আবদুল মজিদ খান। সে বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে 'মজিদ খান শিক্ষা নীতির' প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ নীতিতে প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ৩টি ভাষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের উপরে চাপানোর

প্রস্তাব করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে মজিদ খানের শিক্ষানীতি প্রত্যাহার, বন্দিদের মুক্তি, সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে এগিয়ে যান। মিছিলটি হাইকোর্ট এলাকায় গিয়ে পুলিশের ব্যারিকেডের কারণে থেমে যায়। সেখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা যখন বক্তব্য শুরু করেন, তখন পুলিশ প্রথমে গরম পানি ছিটাতে থাকে এবং লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা এ সময় ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতো চাইলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। গোটা

এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছর চলছে। দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে কখনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে একদলীয়, ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসন চলছে। স্বাধীন দেশে বারবার শাসকের চেহারা ও দল বদলেছে কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। সামরিক স্বৈরাচারের জায়গায় এখন ক্ষমতায় বসেছে বেসামরিক স্বৈরাচার। এই সরকারের শিক্ষানীতিও ব্রিটিশ-পাকিস্তান, ও এরশাদের শিক্ষানীতি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। দেশে এখন শিক্ষা নিয়ে রমরমা বাণিজ্য চলছে। টাকা যার শিক্ষা তার এই নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। মৌলবাদী গোষ্ঠীকে তোষণ করে সরকার পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িক ছাঁচে সাজিয়েছে। এরা গণতান্ত্রিক যুক্তিবাদী মননকে ভয় পায়, মানুষকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত রাখতে চায়। সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ শিক্ষার মূল ধারাকেও কারিগরিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সংকুচিত করছে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রেখে যে একমুখি করণের কথা বলা হচ্ছে, যা প্রতারণার শামিল। অবিলম্বে এই শিক্ষাক্রম স্থগিত রাখার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণের সকল নীতি পরিহার করে সার্বজনীন-বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন সেকুলার একই ধারার গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ছাত্রসমাজ ও শ্রমিক-কৃষকসহ আপামর জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো ও দুর্নীতিবাজদের শাস্তির দাবি



বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

বাম গণতান্ত্রিক জোট আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, লুটপাট ও মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করতে হবে, ফ্যাসিবাদী এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। ব্যবসাবাণিজ্য, সম্পদ বাড়ানোর জন্য ক্ষমতাসীন দলের ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিশালী বেপরোয়া বাজার সিডিকেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যা এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে বলে মনে হয় মন্ত্রীদের কথায়। এদের গণশত্রু হিসেবে আখ্যা দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ প্রকৃত উৎপাদক কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে, উৎপাদন ব্যয় কমাতে

কম মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের দাবি জানান। কৃষকের খেতের পানি পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সার, ভেজালমুক্ত কীটনাশক নিশ্চিতের আহ্বান জানান

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিসের সভাপতিত্বে ৬ ফেব্রুয়ারি '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের খালেদুজ্জামান লিপন, বাসদ (মার্কসবাদী)র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহিদুল ইসলাম সবুজ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবিবির কেন্দ্রীয় নেতা কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন।

সমাবেশে শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের

২০তম বার্ষিক মিলনমেলা

২৬ এপ্রিল ২০২৪, সকাল সাড়ে ৯টা

টিএসসি মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

২১-২৩ এপ্রিল ২০২৪

তিস্তামার্চ সফল করুন

- ২১ এপ্রিল '২৪ সকাল ১০টায় ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তিস্তামার্চের উদ্বোধন, বিকেল ৪টায় সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন সংলগ্ন আব্দুর রউফ মুক্ত মঞ্চে সমাবেশ ও বগুড়ায় রাতযাপন
- ২২ এপ্রিল '২৪ সকাল ১১টায় বগুড়া সাত মাথায় সমাবেশ ও পথে পথে সমাবেশ শেষে রংপুরে রাতযাপন
- ২৩ এপ্রিল '২৪ সকাল ১০টায় রংপুর শাপলা চত্বরে সমাবেশ শেষে পথে পথে সভা

বিকেল ৪টায় তিস্তাব্যারেজ সংলগ্ন বাজারে

সমাপনী সমাবেশ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ

লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই

এ বছর ২১ জানুয়ারি রুশ বিপ্লবের নেতা এবং বিশ্ববিপ্লবের প্রেরণা ড. ই. লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি '২৪ সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র-এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমদ মিলনায়তনে, 'লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই' শিরোনামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড বদরুদ্দীন উমর, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি'র সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরোফা মিশু। সভা পরিচালনা করেন কমরেড ডা. হারুনুর রশীদ।

[কমরেড খালেকুজ্জামানের প্রদত্ত বক্তব্য ভ্যানগার্ডে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে। এ সংখ্যায় প্রথম কিস্তি। সম্পাদক]

মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তী মার্কসবাদের দিশারী রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিনের প্রয়ানের শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর শিক্ষা ও স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন জানাতে আসা উজ্জ্বল উপস্থিতি, সবাইকে লাল সালাম ও শুভেচ্ছা। আমার এবং আমাদের দলের কিছু নেতাকর্মী আজকে এখানে হাজির হওয়ার প্রধান কারণ মান্যবর গুণীজনদের আলোচনা শুনে সমৃদ্ধ হওয়া। আলোচ্য বিষয়ে আমাদের দলের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে নানা উপলক্ষে আমরা প্রকাশনা বের করেছি, নানা ফোরামে কথা বলেছি; আজ ভিন্ন আঙ্গিকে দলের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য হাজির করছি।

২১ জানুয়ারি ২০২৪, পৃথিবী রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিনের মৃত্যুর শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, যে লেনিন প্রথম শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবের পথপ্রদর্শক এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবনার রূপকার। সোভিয়েত বিপ্লব মানব ইতিহাসের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে সর্বোত্তম। আমরা জানি মানব ইতিহাস সময়ের সাথে সাথে নানা বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলি পার করেই বর্তমান অবস্থায় এসেছে। কমিউনিস্ট ইশতেহারে এই কথাটা বলা হয়েছিল যে, অতীতে যে সব শ্রেণি ক্ষমতা পেয়েছে, তারা তাদের অর্জিত অধিকার সুরক্ষিত করতে বা চারপাশে সুরক্ষার দুর্গ গড়ে তুলতে সমগ্র সমাজের উপর তাদের লুণ্ঠনের শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল ভিন্নতর এক শোষণের ব্যবস্থা। ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবের আগে, যখন যে ঘটনার পরিক্রমা মানব ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করেছে, সেইসব ক্ষেত্রে এই কথা তো সত্য। এমনকি যখন সমাজে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে এবং বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তখনও সেই কথা সত্য। ফরাসি বিপ্লবের কথা তো আমরা জানি। তাছাড়াও, যেমন ইউরোপের অনেক দেশে ১৮৪৮-৫০ সাল পর্বে বিপ্লব হয়েছে বা বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেই সব বিপ্লবে সদ্য প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কসের চিন্তানুসারে শ্রেণি হিসাবে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নেওয়ার কথা তার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতা নিয়ে সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এঙ্গেলস-মারা যাওয়ার অল্প সময় আগে, ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন কমিউনিস্ট ইশতেহারের ইতালিয় সংস্করণের ভূমিকা লেখেন তাতে ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লবের চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন যে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল কেবলমাত্র ফরাসি শ্রমিকদের। ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়াতে শ্রমিকরা প্রথম থেকেই বুর্জোয়াদের শাসন-ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কিছুই করেনি। ফ্রান্সের শ্রমিকরাও বুর্জোয়া শ্রেণির



সাথে তাদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাদের শ্রেণি সচেতনতা সেই পর্যায়ে ছিল না। তাই শোষণহীন সমাজ গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিপ্লবের সুফল ভোগ করেছে বুর্জোয়ারা।

ইউরোপে যারা 'সর্বহারা একনায়কতন্ত্র' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে প্যারি কমিউন সম্পর্কে মার্কসের প্রবন্ধের উপর মন্তব্য (postscript) এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, মহাশয়, আপনি কি জানতে চান এই একনায়কতন্ত্র দেখতে কেমন? প্যারিস কমিউন দেখুন। সেটা ছিল সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব।' স্বল্পস্থায়ী এই পর্ব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণিই প্রথম নতুন এক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস করেছিল যেখানে চিরতরের জন্য শোষণ অবসানের সম্ভাবনার অঙ্গীকার ছিল। ফলস্বরূপ, সূচনা হয়েছিল এমন একটি বিশ্ব-ব্যবস্থার যার একদিকে ছিল নিষ্ঠুর জোর-জুলুম, শ্রম-শোষণ, অবিচার-অন্যায়, অত্যাচার ও নরঘাতী যুদ্ধ-নির্ভর সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত শিবির; অন্যদিকে শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বাধীন সম্ভাবনাময় সমাজতান্ত্রিক শিবির। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা হলো যে, সেই সম্ভাবনাময় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব আজ আর নেই। এইরকম একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখজনক পরিণতির পর দেশে দেশে মুক্তির লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এখনও যারা শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন, মানব-মুক্তির জন্য বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ও মননে ধারণ করেন, তাঁরা কি এখনো কবির ভাষায় বলে ওঠেন—'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন? এমন প্রশ্ন উঠে আসা খুব স্বাভাবিক, কারণ লেনিনের মৃত্যুর এক শত বছর পরে বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতা নানা বিচারে আর সেই অবস্থায় নেই। এমন কথা অনেকেই বলেন এবং প্রায় সবাই স্বীকার করেন। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতেই অনেকে মার্কসবাদ বা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরে গিয়ে ভাবি তাহলে দেখব যে, পরিবর্তনের ভাবনার পেছনে সত্য আছে ঠিকই, তবে তা আংশিক সত্য। দৃষ্টি-বিভ্রমের জন্য সত্যের যে অংশ আমাদের চোখে পড়ে না তা হলো যে, চরিত্রগত দিক থেকে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের বাস্তবতা এখনও অপরিবর্তিত আছে। মার্কস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছিলেন আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক গতিসূত্রকে (the economic law of motion) প্রকাশ করাই এই কাজের অর্থাৎ 'দাস ক্যাপিটাল'-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমাদের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত সেটাকেই পরখ করে দেখা যে, বর্তমান সময়ের পরিবর্তনের মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত আছে কিনা যা প্রমাণ করে মার্কস বর্ণিত আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক গতিসূত্রের মৌলিক আধারটি অকার্যকর হয়ে উঠেছে।

মার্কস পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক গতিসূত্র ব্যাখ্যা

করতে উপস্থিত করেছিলেন উৎপাদন সম্পর্কের (Capitalist Production of Relations) ধারণা। মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিবাদী সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বুঝতে পুঁজির মালিক এবং মজুর-শ্রমিকদের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক বুঝতে হবে। পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতির ঐতিহাসিক শর্ত হিসাবে কেবল পণ্য এবং মুদ্রার অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন শ্রম-শক্তিরও যার জন্য একদল মুক্ত শ্রমিক বাধ্য হবে সেই শ্রমশক্তিকে বাজারে বিক্রি করতে যা কেবল তাদের জীবন্ত দেহই থাকে। (The labourer, instead of being in the position to sell commodities in which his labour is incorporated, must be obliged to offer for sale as a commodity that very labour power, which exists only in his living self) (পুঁজি, খণ্ড-১, ১৭৯)। পুঁজির সম্পর্ক মূলত, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত এবং তাই শ্রমিক ক্রমাগত বাজারে বিক্রোতা হিসেবে এবং পুঁজিপতি শ্রমশক্তির ক্রোতা হিসেবে হাজির হয়। মার্কস বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদী উৎপাদন, তাই, একটি অবিচ্ছিন্ন সংযুক্ত প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে, উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসাবে, শুধুমাত্র পণ্য এবং উদ্ভূত মূল্যই উৎপাদন করে না, এটি পুঁজিবাদী সম্পর্কেও উৎপাদন করে এবং পুনরুৎপাদন করে; যার একদিকে পুঁজিপতি, অন্যদিকে মজুর শ্রমিক।' (Capitalist production, therefore, under its aspect of a continuous connected process, of a process of reproduction, produces not only commodities, not only surplus value, but it also produces and reproduces the capitalist relation; on the one side the capitalist, on the other the wage labourer.) (পুঁজি, খণ্ড-১, ৫৭৭) বর্তমান বিশ্বে এই বাস্তবতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, যা ঘটেছে তা হলো এই শ্রমশক্তির বাজারটিকে পুঁজিপতিরা শুধু নিজেদের দেশের গভীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাইরেও বিস্তৃত করেছে। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের এই প্রক্রিয়াটির অস্তিত্বও নতুন নয়, বুর্জোয়াশ্রেণি প্রথমাবধি তাই করে এসেছে এবং এখনও করে চলেছে। মাত্রাগতভাবে তা ভিন্ন হলেও মৌলিক চরিত্র হিসাবে সেটা একই রকম আছে। ১৮৪৮ সালেই মার্কস-এঙ্গেলস যা বলেছিলেন, তা যদি পাঠ করি তবে আজকের পরিবর্তনের চরিত্র মৌলিকভাবে ভিন্ন তা বলা যাবে না।

কমিউনিস্ট ইশতেহারে বলা হয়েছিল, 'নিজেদের প্রস্তুত পণ্যের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাড়না বুর্জোয়াশ্রেণিকে পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র বাসা বাঁধতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণি বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও ভোগ্যপণ্যকে বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমিটা যার উপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেক জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত

এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবন-মরণ প্রশ্নের শামিল, এমন সব শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয়, প্রত্যন্ততম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল ব্যবহার করেছে, এমন সব শিল্প যার উৎপাদিত পণ্য শুধু স্বদেশের মানুষের ভোগ্যপণ্য নয়, দুনিয়ার সর্বপ্রান্তের মানুষের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরনো চাহিদা যা দেশজ উৎপাদে মিটত, তার পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে নতুন চাহিদা যা পূরণের জন্য দূরের দেশ ও ভিন্ন আবহাওয়ায় তৈরি পণ্যের প্রয়োজন পড়ছে। পূর্বের স্থানীয় ও জাতীয় পৃথকতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিবর্তে আমরা দেখছি সর্বদিকেই আদান-প্রদান, বিশ্বজুড়ে জাতিসমূহের পরস্পরনির্ভরতা। বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। যে কোন দেশের বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে উঠছে সকল দেশের সাধারণ সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য জাতীয় ও স্থানীয় সাহিত্য থেকে উঠে আসে বিশ্বসাহিত্য।' (মার্কস-এঙ্গেলস, ১৯৭৫, ৪৬-৪৭)

আমরা এই কথা সকলেই জানি যে, পুঁজির অন্তর্নিহিত তাড়নাই যে পুঁজিকে স্থবির থাকতে দেবে না, ক্রমাগত তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে চলবে, তা মার্কস বারংবার উল্লেখ করেছেন। 'পুঁজির একমাত্র চালিকা শক্তি হলো নিজেই নিজেকে বৃদ্ধি করে চলা, উদ্ভূত মূল্য তৈরি করতে পারা...' ('Capital' has one single life impulse, the tendency to create value and surplus value (পুঁজি, খণ্ড-১, ২৪১)। 'পুঁজি হলো তাকে সীমাবদ্ধ করার বাধাকে অতিক্রম করার জন্য অন্তহীন এবং সীমাহীন তাড়না। প্রতিটি সীমায়িত গতি পুঁজির জন্য একটি বাধা' (Capital is the endless and limitless drive to go beyond its limiting barrier. Every boundary [Grenze] is and has to be a barrier [Schranke] for it) (মার্কস, ১৯৭৩, ২৬০)। পুঁজিপতি 'স্ব-সমৃদ্ধকরণের জন্য চূড়ান্ত উদ্যমের প্রতিনিধি, এবং পুঁজির জন্য যে কোনও নির্দিষ্ট সীমা তার কাছে একটি বাধাস্বরূপ এবং সেই বাধা সে অবশ্যই অতিক্রম করে চলে' (represents the absolute drive for self-enrichment, and any definite limit to his capital is a barrier which must be overcome), আর শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদের অস্তিত্বের পক্ষে এটা একটা আবশ্যিক শর্ত ('a necessity for capitalist production – a condition') (রচনাবলি, খণ্ড-৩৪: ১৭৯)। 'অতএব নিজের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ক্রমাগত ছুটে চলা তার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' (it is therefore inherent in its nature constantly to drive beyond its own barrier) (মার্কস, ১৯৭৩, ১৯৮)। এই কারণে পুঁজি-বাজার বা শ্রম-বাজার-উভয়ের ক্ষেত্রে যখন যে সীমাবদ্ধতা তার সামনে বাধা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, তাকে অতিক্রম করে ছুটে চলবার তাড়না থেকেই পুঁজি তার স্বার্থে উপযুক্ত বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এমন নয় যে, পুঁজিবাদের এমন অগ্রগতির ধারণাটি মার্কসের কাছে অজানা ছিল এবং সেই কারণে বর্তমান সময়ের মার্কস অনুসারীদের কাছে একে অভাবনীয় বলে মনে হবে। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজির জগতে কোনো কিছুকে সন্তোষজনক বলে তখনই মনে করা হয়, যখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বাধাগুলো উৎপাদনশীলতার উন্নতিতে এবং উদ্ভূত মূল্যের উৎপাদনে বাধা হিসাবে দেখা দেয় তাকে সফলভাবে অতিক্রম করা যায়। অন্য কথায়, যখন এই বাধাগুলি অতিক্রম করা হয়, বা দূর করা হয়, তখনই ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি পুঁজির প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত বা যথেষ্ট বলে গণ্য হয়। (চলবে)

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার দাবি

বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে সরকারের ভুলনীতি ও দুর্নীতির দায় জনগণ নেবে কেন?

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের গালগল্প এমনই জায়গায় পৌঁছেছে যে, এখন বলা হচ্ছে, নিয়মিত লোডশেডিংয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর ২৯ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দিয়ে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো এবং বলা হলো আগামী অন্তত তিন বছর এভাবেই দাম বাড়তে থাকবে।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের ভুলনীতি, যাকে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীবাঞ্চব নীতি বলে অভিহিত করি এই নীতি ও দুর্নীতির কারণে আজ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত অর্থনীতিতে ও জনগণের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে। এই কাঁটা উপড়ে ফেলার পরিবর্তে জনগণকেই কাঁটায় বিদ্ধ করার নীতি নিয়েছে সরকার। তাই প্রকৃত আয় কমে যাওয়া সাধারণ মানুষের কাঁধে আবারও এই মূল্য বৃদ্ধির বোঝা চাপানো হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে, প্রধানত গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপরে নির্ভর করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। সরকার সে পথে না হেঁটে সরকারদলীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও কমিশনভোগীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য আমদানি নির্ভর জ্বালানি দিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুতকেন্দ্র বসিয়ে রেখে জনগণের ট্যাক্সের হাজার হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জের



নামে এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও বিদ্যুতের ভুলনীতি ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে। ১ মার্চ ঢাকার পুরানা পল্টন মোড়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোট আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য

রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের শামীম ইমাম, বাসদ (মার্কসবাদী) এর ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির আব্দুল আলী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির আমেনা আক্তার। সভা পরিচালনা করেন সিপিবি নেতা অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন রেজা।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশে আরও বলেন, গ্যাস ও কয়লার বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও ফার্নেস ওয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচের ফারাক

অনেক। সরকার ফার্নেস ওয়েলে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেশি করছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনে এই খাত পরিচালিত করলে আজ দুরবস্থায় পড়তে হতো না। এই দুরবস্থার দায় জনগণ নেবে না। এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা দেশের সচেতন মানুষকে প্রতিবাদী হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকার বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনার উদ্যোগ নেয়নি। কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুতকেন্দ্র তৈরি করে খরচ বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি হলে সবকিছুর দাম বেড়ে যাবে। ফলে ব্যবসায়ী সিডিকেট, অর্থপাচারকারী, ব্যাংক ডাকাতে, ঋণখেলাপীদের স্বার্থরক্ষাকারী এই সরকার পরিবর্তন করে মেহনতি মানুষের সরকার গঠন করা ছাড়া মানুষের মুক্তি আসবে না।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র মঞ্চের সমাবেশে পুলিশি হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জনগণের আন্দোলন দমনের এ ধরনের নিপীড়নমূলক পথ থেকে সরকারকে সরে আসার আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাব-তোপখানা ঘুরে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নিকাণ্ডে মরছে মানুষ—দায় নিচ্ছে না কেউ!

ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষ, স্বজনদের হাহাকার ও আহতদের আত্নতলা ভবনের দেশের মানুষ। বেইলি রোডের আটতলা ভবনের পুড়ে যাওয়া কাঠামো দেখে প্রশ্ন জাগে, এই উচ্চমধ্যবিত্ত অভিজাত এলাকায় এমন একটি ভবনে এত খাবার, পোশাকের দোকান কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে দুর্বল তা এত মৃত্যুর বিনিময়ে বুঝতে হলো? এর আগে বড় কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড যেমন, ২০১০ সালে নিমতলিতে ১২৪ জন, তাজরিন অগ্নিকাণ্ড ২০১২ সালে ১১২ জন, চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ২০১৯ সালে ৭১ জন, বনানীতে ২০১৯ সালে ২৭ জনের মৃত্যু কি অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক করেনি কর্তৃপক্ষকে? জীবন হারিয়ে হাহাকার করেই কি বার বার স্বজনরা জীবনের মূল্য খুঁজতে থাকবে? দায় নেবে না কেউ?

যারা এই ভবনটিতে সেদিন গিয়েছিলেন বা যারা আগেও যেতেন তারা কি জানতেন এই ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নেই, এমনকি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনও নেই। এটা কি তাদের জানবার কথা? ভবনটিতে ৮টি রেস্তোরাঁ চলছিল বছরের পর বছর ধরে। ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তরা এখন মাঝে মধ্যে একটু বাইরে খাওয়ার চেষ্টা করে। সে কারণেই সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে খাবারের দোকানগুলোতে ভিড় বেড়ে যায়। এখানেও সেটাই ঘটেছিল। কেউ গিয়েছিলেন শিশুসন্তানদের নিয়ে, কেউ গিয়েছিলেন স্বজনদের নিয়ে, কেউ গিয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। আর কর্মচারীরা! তাদের তো জীবন চলত ওই ভবনে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে।

ফলে রাত পৌনে ১০টায় ভবনটিতে যখন আগুন লাগে, তখনও অনেক মানুষ ছিল সেখানে। আগুন বাড়তে দেখে, প্রাণ বাঁচাতে মা সন্তানকে নিয়ে, বোন বোনকে নিয়ে, বন্ধু বন্ধুকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভবনের ছাদে, বিভিন্ন তলায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিট চেষ্টা

চালিয়ে রাত পৌনে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর পর শুরু হয় মৃতদেহ বের করা আর গোনার মর্মস্পর্শী দৃশ্য। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ১৮ জন নারী ও ৮ শিশু। এই লাশের ভার বহনের বেদনা পরিবারগুলো বহন করবে আজীবন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকসিয়তা, দায়িত্বহীনতা, সমন্বয়হীনতা, পরিকল্পনার অভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ভার বহন করবে কে?

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে, বেইলি রোডের যে ভবনে আগুন লেগেছিল তার নিচতলায় দুটি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বিক্রির দোকান ও একটি জুসবার (ফলের রস বিক্রির দোকান) ছিল। দ্বিতীয় তলায় কাচি ভাই নামের একটি রেস্তোরাঁ, তৃতীয় তলায় ইলিয়ন নামের একটি পোশাকের ব্র্যান্ডের দোকান, চতুর্থ তলায় খানাস ও ফুকো নামের দুটি রেস্তোরাঁ, পঞ্চম তলায় পিৎজা ইন নামের একটি রেস্তোরাঁ, ষষ্ঠ তলায় জেস্টি ও স্ট্রিট ওভেন নামের দুটি রেস্তোরাঁ এবং ছাদের একাংশে অ্যামবেশিয়া নামের একটি রেস্তোরাঁ ছিল। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক জানান, ভবনটিতে অগ্নিনিরাপত্তা ছিল না। ঝুঁকিপূর্ণ জানিয়ে ভবন কর্তৃপক্ষকে তিনবার চিঠি দেয়া হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো নোটিস দেয়ার পর ভবন মালিক যেমন ত্রুটি সংশোধন করেনি, কর্তৃপক্ষও তেমনি কোন ব্যবস্থা নেয়নি। লিফট ছিল দুটি কিন্তু সিঁড়ি ছিল একটি। আগুন লাগার পর বিদ্যুৎ চলে যায়, লিফট বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। কি নিদারুণ অবস্থা আর কি অসহায় মৃত্যু!

নানা কারণে অগ্নিকাণ্ড হতেই পারে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় শহরেও অগ্নিকাণ্ড হয়, কিন্তু ঢাকায় যে সব অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তার সঙ্গে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা থাকার পরও যদি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ঢাকায় যে সব অগ্নিকাণ্ড

হয়েছে সে ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা নেয়া হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানগুলোর কী ধরনের নজরদারি ছিল সে প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে? ফলে এগুলোকে কি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বলা যায় না? ফলে এগুলো নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর পেছনে যাদের দায়িত্ব পালন করার কথা তাদের অনেক ধরনের গাফিলতি জড়িত। মানুষের মনে ক্ষোভ যেমন আছে, হতাশা হয়ে এমন কথাও বলতে শোনা যায়, এ পরিস্থিতির খুব দ্রুত পরিবর্তন হবে এবং আপাতদৃষ্টি একটি নিরাপদ নগরে বসবাস করা যাবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণ, অগ্নি সুরক্ষার অভাব এগুলো দেখার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আগুনে পুড়ে যাওয়া ৪৬ জন মানুষ, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা আরও ২৫ জন মানুষসহ আহত ৭৫ জন মানুষ, ভয়ানক ভবনের ব্যবসায়ী আর চার ঘণ্টা নরক যন্ত্রণা ভোগ করা শতশত মানুষ কি কেবল সংখ্যা? কয়দিন পর বেইলি রোডের ঘটনা ভুলে নতুন মর্মান্তিক মৃত্যু দেখার অপেক্ষা?

সিদ্ধিকবাজার, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মগবাজার, রূপগঞ্জ, বিএম কনটেইনার, চুড়িহাট্টা, তাজরিন, রানা প্লাজা। কোনোটা মার্কেট, কোনোটা কারখানা, কোনোটা আবাসন ভবন সেটি আলাদা করা গেলেও পরিনতি যে মৃত্যু তা তো আলাদা করা যাচ্ছে না।

রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেয়ার কথা। তারা জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় জীবিকা নির্বাহ করেন ফলে প্রত্যাশা তারা জনগণের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর কাজ দাড়িয়েছে মূলত অনুমোদন দেয়া, নোটিশের কিছু কাগজ তৈরি করা। কিন্তু পৃথিবীতে যেসব শহরে সুশাসন এবং মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত, সেখানকার সংস্থাগুলো শুধু কাগজ তৈরি করে না; নিয়মিত পরিদর্শন করে, কারণ দোষ পেলে শাস্তি দেয়।

অনিরাপদ অবস্থায় ভবন পরিচালিত হবে, সেখানে মানুষ যাবে এবং আগুন লাগলে মারা যাবে, এটা কোনোভাবেই অনুমোদন দিতে পারে না তারা। তাই যেখানে যখনই অনিয়ম পায়, সেখানেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়। ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা দেশের কর্মকর্তাদের সেই সংস্কৃতি তৈরি হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মালিক ও প্রভাবশালীরা সংস্থাগুলো দ্বারা ম্যানেজ হবার মানসিকতা প্রবল হয়েছে।

তাই শোনা যাচ্ছে, বেইলি রোডের ভবনটিতে বাণিজ্যিক অনুমোদন নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী মহলের চাপ ছিল। যে কারণে নির্মাণকাজ যথাযথ না হওয়ার পরও ভবনটিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো কোনোভাবেই মানা যায় না যে বাণিজ্যিক ব্যবহার ও রেস্তোরাঁ পরিচালনা একই ধরনের। এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজ। রেস্তোরাঁ মানে আগুন থাকবে, প্রচুর মানুষের সমাগম হবে, যেখানে মাত্র একটি সিঁড়ি, এমন একটি ভবনে রেস্তোরাঁ চলতে পারার কথা না। এসব জেনে এবং দেখেও রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে রাজউক, ফায়ার সার্ভিস, সিটি করপোরেশনের ভূমিকা কি কেবল নোটিশ দেওয়া আর ওরা কথা শোনে না এই অজুহাত দেয়া? যারা প্রভাবশালী বলে আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা এখন কোথায়? তারা কি মানুষের জীবনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ? দিনের পর দিন আর একের পর এর এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিন্তু রাষ্ট্রের টনক নড়বে না, এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? অনুমোদনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি একটা অঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জবাবদিহিতার এবং শাস্তির আওতায় আনা গেলে যারা হারিয়ে গেল তারা ফিরে না এলেও ভবিষ্যতে স্বজন হারানোর আশংকা কিছু কমবে। সে কারণেই কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের কাঠামো পাল্টানোর সংগ্রামটা ভীষণ জরুরি।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই শক্তিশালী করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিল ফোরাম আয়োজিত এই নারী সমাবেশে সহযোগী সভাপতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থেকে আগত সংগ্রামী নারী নেতৃবৃন্দ, মহিলা ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবং সামনে উপস্থিত আমাদের মহান পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, সিপিবি সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বামপন্থি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-নারী, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নানা খাতে কর্মরত শ্রমজীবী, গৃহিণী, নারী-পুরুষ বোন ও ভাইয়েরা। সকলকে এদেশের মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষের দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও লাল সালাম।

দীর্ঘ সময় ধরে মহিলা ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবং বিদেশ থেকে আগত নারী নেতৃবৃন্দ নারীদের সমস্যা-সংকট উত্তরণের জন্য করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আপনারা শুনেছেন কী প্রেক্ষাপটে ১১৪ বছর আগে নারী দিবসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে নিউয়র্কের সুই কারখানায় নারীরা বিদ্রোহ করেছিল। তারা দাবি করেছিল কর্মঘণ্টা কমাতে হবে, মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে, অভিবাসী ও কৃষাঙ্গ নারীদের উপর যে বর্বর নির্যাতন তা বন্ধ করতে হবে, কর্মপরিবেশ মানবিক করতে হবে। একই সাথে তারা আওয়াজ তুলেছিল নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে। হাজারো নারীর সেই বিক্ষোভে বর্বর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল আমেরিকার সরকার ও নিউ ইয়র্কের পুলিশ। বহু নারী নিহত-আহত হয়, গ্রেপ্তার করা হয় অনেককে। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। তারই জেরে ১৯১০ সালে জার্মান কমিউনিস্ট নেতা ক্লারা জেটকিন নারীদের এক সম্মেলনে দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন এবং তার পর থেকেই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

আমরা জানি আমাদের এই সভ্যতা নারী-পুরুষের মিলিত সংগ্রামের ফসল। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রম বিভাজন হলো নারী পুরুষের শ্রম বিভাজন। কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পশু পালনের সূচনায়ও নারীদের ভূমিকা ছিল প্রধান। ইতিহাস বলে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায়ও সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব এবং সমাজে শ্রেণিবিভক্তি নারীদের অধস্তন করে ফেলে। নারী হয়ে পড়ে পুরুষের অধীন। অর্থনৈতিক, মানসিক, শারীরিকভাবেও সেবাদাসী।

যখন থেকে সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হয়েছে তখন থেকেই নারী এবং শ্রমজীবী মানুষ বরাবরই শোষিত হয়ে আসছে। মানবজাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল। সমাজ কাঠামোর নানা পরিবর্তন এসেছে কিন্তু শোষণের পরিবর্তন হয়নি। কখনও কখনও শ্রমজীবীরা কিংবা নারীরা তাদের এই দাসত্বের অবস্থা সমন্ধে সজাগ হয়ে প্রতিবাদী হয়েছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এই দাসত্বের অবস্থাটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে শেখানো হয়েছে। কখনও কখনও এমনও বলা হয়েছে নারীদের মস্তিষ্ক ছোট, শারীরিকভাবে দুর্বল এবং এসকল কারণেই তারা পুরুষের অধস্তন। কিন্তু ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। আফ্রিকার কোনো কোনো আদিবাসীদের মধ্যে এখনও নারীদের কর্তৃত্ব করতে দেখা যায়। আফগান উপজাতিদের মধ্যেও দেখা যায় নারীরা যুদ্ধ করে, শিকার করে আর পুরুষরা ঘরকন্নার কাজ করে। পশ্চিম আফ্রিকার আশান্তির রাজার এবং মধ্য আফ্রিকার ডাহমির



রাজার দেহরক্ষীর কাজ করতেন নারীরা এবং কোনো কোনো সৈন্যবাহিনীর কাজও পরিচালনা করার জন্য শুধুমাত্র নারীদেরই গ্রহণ করা হতো। প্রাচীনকালে কৃষসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত তথাকথিত যে অ্যামাজন রাষ্ট্রগুলি ছিল, সেগুলো সম্পূর্ণভাবেই নারীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় শারীরিক বা মানসিক কারণে নারীরা অধস্তন এগুলো আসলে ভুল্লি যুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় নারীদেরকে অধস্তন রেখে নারীজাতিকে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। সমাজের প্রয়োজনেই নারীকে গর্ভ ধারণ করতে হয়, সন্তান জন্মানোর পর কিংবা শিশুকে স্তন্যদানের এই সংবেদনশীল সময়ে শারীরিকভাবে শক্তিশালী পুরুষেরা নারীদের উপর বর্বর অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে এসেছে এবং কর্তৃত্ব হাতিয়ে নিয়েছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় নারী পুরুষের শারীরিক পার্থক্য প্রাকৃতিক কিন্তু বৈষম্য সমাজসৃষ্ট।

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্মোচকালে দেখি শ্লোগান উচ্চারিত হলো সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। একই সাথে তারা নারী স্বাধীনতার কথাও বলল। কিন্তু মুনফালিস্ট পুঁজিবাদ অচিরেই সেইসব শ্লোগানকে বুলিতে পরিণত করল। সাম্য পরিণত হলো টাকাওয়ালাদের সমতায়, মৈত্রী হলো বুর্জোয়াদের মধ্যে আর পুঁজিপতিদের জন্য অবাধ স্বাধীনতা। নারী স্বাধীনতা নারীর সস্তা শ্রম শোষণের কায়দায় পরিণত হলো। আর তার সাথে যুক্ত হলো নারীদেহকে পণ্যে পরিণত করা। মার্কস যেমন বলেছিলেন, পুঁজিবাদ সকল কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে, তেমনি তারা নারীকেও পণ্যে পরিণত করে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করতে থাকল। এর আগের সমাজ ব্যবস্থাগুলোতে যেখানে নারীকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল, পুঁজিবাদ সেই দশা থেকে তাকে মুক্ত করে তার শরীর এবং শ্রমকে সর্বোচ্চ মুনাফা নিংড়ে নেয়ার কাজে লাগালো। এর ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীমুক্তি সম্ভব হয়নি, হয়েছে নারীর উপর শোষণ। নারীকে একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের শিকার হতে হচ্ছে আবার অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থারও বলি হতে হচ্ছে। এই দ্বৈত শোষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজকের দিনের নারীসমাজ।

আমাদের মতো অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশে নারীদের মুখোমুখি হতে হয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক আক্রমণেরও। এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নারীকে কেবল ভোগ্য সামগ্রীই মনে করে গৃহে অন্তরীণ করে রাখতে চায়। ওয়াজ-মাহফিলে তারা নারী বিদেষী নানা বক্তব্য দিতে থাকে। নারী-পুরুষের সমতা, নারীর স্বাধীনতা কিংবা নারী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা অথবা চাকরি করা ইত্যাদিকে তারা শরিয়ত বিরোধী বলেও প্রচার করে থাকে। দেশের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী এদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে নানাভাবে তোষামোদ করে চলে। যার ফলে আমরা এখনও দেখি

ফতোয়া দিয়ে গ্রামাঞ্চলে নানাভাবে নারীদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।

আবার সমাজের মধ্যে এমন মনস্তত্ত্বও চালু আছে, যেটা শুধু পুরুষের মধ্যে নয় অনেক নারীও মনে করেন যে, নারী কেবল ঘরের কাজ করবে, সন্তান জন্মান, প্রতিপালন করবে এতেই নারী জীবনের চরম সার্থকতা। নারী যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে সে অন্য যে কোনো তথাকথিত পুরুষ যা করতে পারে বা সামাজিকভাবে যা পুরুষ দক্ষতা বলে বিবেচিত তা সে করতে পারে বা তাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে এই বোধের স্ফূরণ ঘটানো ছাড়া নারী মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে নেয়া যাবে না। আমাদের দেশের মহিষী নারী বেগম রোকেয়া যথাযথভাবেই তা বুঝেছিলেন এবং লিখেছিলেন।

আমাদের দেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা থাকলেও আমরা দেখি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকে বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। পারিবারিক আইন এখনও ধর্মীয় বিধি দিয়ে পরিচালিত হয়, ফলে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের প্রশ্নে নারীকে হতে হয় চরম বৈষম্যের শিকার। পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সমানঅধিকার এখনও অর্জিত হয়নি। গোটা সমাজজুড়ে নারীকে মর্যাদার চোখে দেখার কোন মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্যতম ব্যবসায়িক উপাদান হচ্ছে পর্নোগ্রাফি যার বিস্তার ঘটছে আমাদের দেশসহ সর্বত্র। এর সাথে আছে পতিতাবৃত্তি আর মাদকের ভয়াবহ আত্মসন। এর ফলাফল হিসেবে নারীর উপর যৌন সহিংসতা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বহু গুণ বেড়েছে। ধর্ষণ-গণধর্ষণ, যৌতুকের জন্য হত্যা, রাস্তায় নারীকে উত্ত্যক্ত করা, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি অতীতের যে কোন রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। যে সকল নারীরা এত প্রতিকূলতা পেরিয়ে কাজে যোগ দিচ্ছে তাদেরকে কর্মস্থলে নানারকম বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। গণপরিবহনে নারীর উপর সহিংসতার বেশ কিছু খবর এরই মধ্যে পত্র পত্রিকায় এসেছে। যে সব তথ্য প্রকাশিত হয় তাতেই দেখা যায় সংকটের ভয়াবহতা। ৩৩ শতাংশ নারীশ্রমিক পুরুষের সমান কাজ করে কম মজুরি পান। প্রায় ৯৫ শতাংশ নারী তার জীবনে কখনও না কখনও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প খাত গার্মেন্টস। এই খাতে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী। এই খাতে মজুরি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গার্মেন্টসের মজুরির চাইতে অনেক কম। চা-শিল্পে প্রায় ৯০ শতাংশ নারী সেখানেও আমরা দেখি ২৩ কেজি পাতা তুললে তার দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা যা এক ডলারের চাইতে কিছু বেশি। অর্থাৎ নারী প্রধান শিল্পগুলিতে মজুরি অত্যন্ত কম। অথচ গার্মেন্টস-চা

এর মতো শিল্পগুলি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান নিয়ামক। যে সকল নারীরা সূর্যোদয় থেকে রাত পর্যন্ত গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকেন সেই কাজের কোনো স্বীকৃতি পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে নেই। গৃহস্থালি কাজের কোন মূল্য নিরূপণ হয় না কিংবা অর্থনীতিতে মূল্য সংযুক্ত হয় না। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশেও যাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। প্রধানত, মধ্যপ্রাচ্যে গৃহশ্রমিক হিসেবে নারীরা যাচ্ছেন সেখানেও নানা নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়াবহ অবস্থার কথা তারা জানাচ্ছেন। গত বছর ১৬৪ জন নারী কম্বীর লাশ এসেছে বিদেশ থেকে। এই প্রবাসী নারী শ্রমিকদের জন্যও রাষ্ট্র কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমাদের দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। প্রায় ২ লাখ নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকরদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ছিলেন। এই অসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীন দেশে আজ নারীদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে এর জন্যই কি দেশ স্বাধীন হয়েছিল? এই কী আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের নমুনা?

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে। পরপর তিনটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে ক্ষমতাসীন হয়ে আছে সরকার। উন্নয়নের নামে বিশাল বিশাল প্রকল্পে তারা বিশাল চুরি-লুটপাট করছে। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করছে। গ্যাস-বিদ্যুতসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। অল্প কিছু মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ছে। আর গোটা দেশটাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলছে। নিজেদের এই লুটপাট আর অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কণ্ঠস্বরকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে চলেছে সরকার। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে। ফ্যাসিবাদ যখন আসে তখন সকল ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর খড়গ নেমে আসে। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বব্যাপীই বাঁচার সংগ্রাম কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তো রীতিমতো বিপজ্জনক। এর কারণ হলো পুঁজিবাদ তার অন্তিম দশায় পৌঁছে গিয়ে নিজেদের রক্ষার চেষ্টায় আগের যে কোন সময়ের তুলনায় নৃশংস ও সর্ব প্রকার মানবিক বিবেচনা-বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। আমেরিকায় ট্রাম্পইজমের মতো সাদা বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিপুষ্ট করছে এবং তার বিস্তার ঘটছে। এটা আমরা জানি গণতান্ত্রিক অধিকার যত সংকুচিত হয় তার সবচেয়ে প্রবল আক্রমণের শিকার হতে হয় দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং নারীদের। যার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের একাদশ কর্মী সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত



ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তথা দক্ষমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে বস্তুজগত, সমাজজীবন বিচার বিশ্লেষণের ধারা সঠিকভাবে আয়ত্ত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষার অংশ হিসেবে তিন দিনব্যাপী একাদশ কর্মী সদস্য সম্মেলন স্বাধীনতা হল, ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ,

রতন, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, জনার্দন দত্ত নাটুসহ ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ছাত্র ফ্রন্টের কর্মী সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুজা বাউই এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের সম্বলনায় কর্মী সদস্য সম্মেলনে কমরেড খালেকুজ্জামান প্রণীত শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে, অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার প্রণীত ছোটদের রাজনীতি ও ছোটদের অর্থনীতি-

বইয়ের উপর আলোচনা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিন উল্লিখিত বইয়ের আলোচনা এবং তৃতীয়দিন সংগঠনের আগামী দিনে করণীয় কাজের পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রতিদিনই ছাত্র নেতৃবৃন্দের আলোচনা শেষে পার্টি নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। এছাড়াও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বুর্জোয়া ভোগবাদী আদর্শহীন রাজনীতির বিপরীতে আদর্শবাদী বিপ্লবী রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আলোচনা করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষানীতি ও দর্শন, শিক্ষার অধিকার নিয়ে এবং এর পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অনেক ভাবনা ও পরিকল্পনা হাজির করা হয়েছে কিন্তু তা কোনো সময়েই ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে পারেনি। সমাজ বিকাশের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। পরাধীন এবং স্বাধীন দেশে শাসকরা তাদের শাসন শোষণমূলক ব্যবস্থার অনুকূলেই শিক্ষা দিতে চেয়েছে, নীতি প্রণয়ন করেছে। প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে জীবন দিয়েছে, রক্ত বরিয়েছে। সেজন্য শিক্ষানীতি নিয়ে একটা বিতর্ক সবসময়ই থেকে গেছে। এখনও সে বিতর্ক

থামেনি, চলছে। শিক্ষার নীতিগত দিক, অর্থাৎ শিক্ষা কি সবাই পাবে, কী হবে বিষয়বস্তু, এবং এর উদ্দেশ্য কী হবে। এসব বিষয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সামনে পরিষ্কার থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পদ্ধতিগত দিক অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হবে, শিক্ষার গুণ-মান যাচাই, সিলেবাস, কারিকুলাম কীভাবে রচিত হবে, সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন-বিস্তারিত, সময়সীমা নির্ধারণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিচালনা ব্যবস্থা কীরকম হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। তাই বিষয়টিকে জাতির মৌলিক ভাবনায় বিবেচনা নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

কর্মী সদস্য সম্মেলনে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলা, সংগঠনের দক্ষ করা, ছাত্র সমাজকে সচেতন করা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ ছুঁগিতসহ শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে কার্যকর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নয়, দুর্নীত রোধ কর

ভুলনীতি ও লুটপাটের দায় জনগণ কেন নেবে?

বাম জোটের জ্বালানি মন্ত্রণালয়
অভিযুক্তি বিক্ষোভে পুলিশি বাধা

সমস্বয়ের নামে ধাপে ধাপে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণার প্রতিবাদে এবং বিদ্যুৎ খাতের বিপর্যয় ও সংকটের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত ও বিচারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট ১১ মার্চ '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিযুক্ত বিক্ষোভের আয়োজন করে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম জোটের সমস্বয়ক ও সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিযুক্ত বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে পল্টন মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এ সময় পুলিশ বাম জোটের নেতৃবৃন্দসহ নেতাকর্মীদের সাথে ব্যাপক ধস্তাধস্তি করে। এরপর বাম জোটের নেতাকর্মীরা পল্টন মোড়ে ব্যারিকেডের সামনে সমাবেশ করে।

এখানে জোটের সমস্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমস্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরফা মিশু, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ও সিপিবি'র

সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশি বাধা ও দুর্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণের অধিকারের দাবির মিছিল না ঠেকিয়ে দুর্নীতিবাজ, বিদ্যুৎ খাতের লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করুন। যাদের নীতির কারণে আজ বিদ্যুৎ খাত

জনগণের গলার কাঁটায় এবং দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকি হয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করুন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়লে সর্বত্র উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়। ইতিমধ্যেই বরেন্দ্র অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পানির বিল ঘণ্টা প্রতি ৩০ টাকা বেড়ে গেছে, আরও বাড়বে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি সর্বত্রই এক অসহনীয় অবস্থা নিয়ে আসবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে আগে গণশুনানি করা হতো। সেখানে মানুষ কথা বলতে পারত। যদিও সে কথা মানা হতো না, সরকারের সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করা হতো। সরকার মানুষের কথা শুনতে চায় না, ভয় পায়। তা গণশুনানি বাদ দিয়ে দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, জ্বালানি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে ভূমিকা নেয় এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং তারা বিদেশি কোম্পানি ও দেশি-বিদেশি লুটেরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করে।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা জনগণের টাকায় হলেও তারা আজ লুটপাটকারীদের সহায়কের ভূমিকা পালন করছে।

ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএম কলিম উল্লাহ মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির

উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধকালীন ২নং সাব-সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান ৫ জানুয়ারি ২০২৪ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএম কলিম উল্লাহ মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবার, সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, জনাব কলিম উল্লাহ বার্ষিকজনিত রোগে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর।

বিবৃতিতে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বরণ্য শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক, অকুতোভয় সৈনিক, জনদরদি প্রকৃত দেশপ্রেমিকে মানুষকে হারালো। দেশ মানুষের প্রতি যার ছিল অগাধ ভালোবাসা।

বাংলাদেশের নারী নেতৃবৃন্দের সাথে আন্তর্জাতিক নারী নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে ১০ মার্চ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বামপন্থি নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি কমরেড শম্পা বসুর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জার্মান এমএলপিডি দলের চেয়ারওম্যান গাবি ফেচনার, অল নেপাল উইমেন্স এসোসিয়েশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আং দাওয়া শেরপা, সর্ব এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪



গণমানুষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন চাই

সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের
মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ

সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময়সভা ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক বিমল কান্তি দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার শুরুতে সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন কবি রঘু অভিজিৎ রায়। এরপর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন।

সভায় আলোচনা করেন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লালু, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক রহমান মুফিজ, বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক দীনবন্ধু দাশ, ভাগ্যকুল পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি মুজিব রহমান, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুন নূজহাত মনীষা, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের সাবেক সমন্বয়ক শহিদুল আলম নান্নু, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. সামছুল আলম, সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বাকী বিল্লাহ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর মুসীগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি শ. ম. কামাল হোসেন প্রমুখ। আবৃত্তি করেন কবি হাসান ফকরী, তিথি সুবর্ণা।

আলোচনায় নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘদিন যাবত সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর নানান দিক থেকে আক্রমণ চলছে। যাত্রা অনুষ্ঠান, বাউল গান, নাটকের মঞ্চ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে হামলা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ভাষার ভাঙা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরি করে শত শত সাংস্কৃতিক কর্মী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক, বাজার ও অর্থনীতিতে চলছে লুটপাট। মানুষ দিশেহারা, বাঁচার পথ দেখছে না। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি চাইলে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। গণতন্ত্র নেই, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। এমন এক পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি কর্মীদের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই। সাংস্কৃতিক অঙ্গণের যেসকল ব্যক্তিবর্গ শাসকদের লুটপাটের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে বয়কট করে সকল প্রগতিশীল সংগঠনসমূহকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গণমানুষের সপক্ষে দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা প্রগতিশীল ধারা গড়ে তুলতে হবে, এগিয়ে নিতে হবে।

সূচনা বক্তব্যে বলা হয়—সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

আপনারা অবগত আছেন, সংস্কৃতিকর্মীগণসহ দেশবাসী এক বিশেষ সংকটকাল অতিক্রম করছে। সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব আজ হুমকির মুখে। রাস্তায় কালাকানুন ও মস্তানতন্ত্র বিবেকবান মানুষের কণ্ঠ চেপে ধরে আছে। '৭১ পরবর্তী সময়ে মানুষ একটা যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক ইহজাতিক চিন্তার জাগরণ দেখতে চেয়েছিল। তা হয়নি। বরং শাসক সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে সে সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করে চলেছে। আজ রাস্তায় পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে মৌলবাদীতার প্রতি নতজানু নীতি। মৌলবাদী শক্তিকে তুষ্ট করতে আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতির ঐতিহ্য বাউল গান, কবি গান, যাত্রা-পালা করার পরিবেশ রক্ষা করতে রাষ্ট্র শুধু ব্যর্থ নয়; বরং নিরাপত্তা ও শান্তি ভঙ্গের অজহাত দেখিয়ে আমাদের লোকঐতিহ্য ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে নানা টালবাহানা করে আয়োজন করতে দিচ্ছে না। বাউল ও গ্রামীণ শিল্পীরা বারবার আক্রান্ত হয়ে আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায়



নিপতিত। অথচ নিরাপত্তার দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রেরই। বাউল শিল্পীরা মৌলবাদীদের শিকারই শুধু নয়, তাদেরকে জেলে ঢুকানো হচ্ছে। সংস্কৃতি বিরোধী তৎপরতার মূল উৎপাতন ও দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির বিধান না করে সরকার তাদের মদদ দিচ্ছে। সার্বিকভাবে এক বর্বরযুগ যেন আমাদের ওপর চেপে বসেছে। লোভ, ভোগ ও ভয়ের এক সর্বগ্রাসী রূপ সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে কায়েমে মরিয়্যাত বর্তমান শাসককূল। বর্বরতার সংস্কৃতিতে পশ্চাদপসরণ শুধু নয়, তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল মিডিয়া, ফেসবুক, টিকটক ইত্যাদির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের কুৎসিত, নোংরা, যৌনতান্ত্রিক অপসংস্কৃতি ও মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়ছে। এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেই। কিন্তু নাগরিক সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবাদী ও ভিন্নমতের গন্ধ পেলেই তাতে রাষ্ট্রীয় বাধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সেখানে রাষ্ট্রের উৎসাহের কমতি নেই। ভিন্নমতকে রাষ্ট্র আজ সহ্য করতে পারছে না। তবে কী প্রগতিবাদী ও প্রতিবাদী সংস্কৃতি কর্মীগণ তাতে আত্মসমর্পণ করবে?

আমরা সকলেই জানি, সংস্কৃতিকর্মীদের আছে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের এক সংগ্রামী ঐতিহ্য। ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কৃষকজনতার মুক্তির অকুতোভয় লড়াইয়ের সহযাত্রী ছিল সংস্কৃতিকর্মীগণ। আমরা সুকান্ত ভট্টাচার্য, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ, জয়নুল আবেদীন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলীল চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, রুদ্দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর যেমন উত্তরসূরি, তেমনি প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ, মুক্তিযুদ্ধপূর্ববর্তী সময়ে গণমানুষের সপক্ষে বলিষ্ঠ লড়াই ছায়াট, উদীচী, ক্রান্তি, সৃজনী, উন্মেষ, লেখকশিল্পী সংগ্রাম শিবির, নাট্যফৌজের উত্তরসূরি। শুধু তাই নয়, বিশ্ব-প্রগতিবাদী সংস্কৃতির লড়াইয়ের বিপ্লবী যোদ্ধাদেরও উত্তরসূরি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্য আন্দোলন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কালে শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

তবে পরবর্তীতে অনেকেই আর তাদের কর্মকাণ্ডের সেই গৌরব ও গুজ্জল্য ধরে রাখতে পারেননি। নিকট অতীতে বীরোচিত ভূমিকা রেখেও কিছু সংস্কৃতির কথিত 'আইডল' ও সংগঠন আজ নেষ্কারজনক কালিমালিপ্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ। যারা একদিন ছিলেন 'প্রগতি'র পতাকাবাহী, তারাই আজ জনগণের মহাদুর্দিনে মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব তথা সংস্কৃতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার গণবিরোধিতার তল্লাহবাহক নীতিহীন, মেরুদণ্ডহীন দালালে পরিণত হয়েছে। তারা প্রকৃতই হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী, আপসকারী, শাসকদের পদলেহি; আর জনগণের সপক্ষের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাজ করছে বিভিন্ন রকম মতাদর্শিক ও সাংগঠনিক ভিন্নতা, চিন্তার প্রকট দৈন্য ও ছবিবিরতা। এসব কারণে সাম্প্রতিক বেশ কয়েক বছর ধরে সাধারণ নিপীড়িত জনগণ ও সংস্কৃতি কর্মীদের যেন আর আগের মতন তাদের নিজেদের আপন মানুষ মনে করতে পারছে না।

শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের

অতীতের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে পুনরুদ্ধার করার মহান দায়িত্ব আজ আমাদের ওপর। এ অবরুদ্ধ সময়কে অতিক্রম করতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক লড়াই-আন্দোলন জারি রাখা দরকার। আর এ লড়াই জারি রেখে জয় লাভ করতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি জনগণের সংগ্রামে একাত্ম হবার বিকল্প নেই। সংস্কৃতিকর্মীদের জনগণের কণ্ঠ হয়ে ওঠার সে দায় পালনের মহান কর্তব্য আজ নতুন তরুণ প্রতিবাদী সংস্কৃতিকর্মীদের ওপর পড়েছে। জাতির সকল ক্রান্তিকালে সমাজের বিবেক বা গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মী, শিল্পী-কবি ও বুদ্ধিজীবীগণ। তাই কীভাবে জনগণের মধ্যে আশা জাগিয়ে তোলা যায় তা কিন্তু কিছু কিছু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা ভাবছেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক। একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াই দাবানল জ্বালাতে পারে—এ সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই।

এ বন্ধ্যাত্ম থেকে বেরিয়ে আসার লড়াইয়ে তাই আমাদের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংস্কৃতির যোদ্ধাদের, তথা আমাদের চেতনায় ও কর্মপদ্ধতিতে এক ধরনের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেও এক যুদ্ধ। আজ এক সংগঠন অন্য সংগঠনের সাথে কাজ করার সম্মতিতে নানা রকম দ্বিধা থাকে। কোনোটি সাংগঠনিক, কোনোটি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়, কোনোটি মতাদর্শের নামে, কারো কারো মধ্যে এমনও দেখা যায় কথিত 'শুদ্ধ-পবিত্র' মতাদর্শের নামে প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইকেও অস্বীকার করে। একে আমরা কী বলে চিহ্নিত করবো মতাদর্শিক-সাংগঠনিক দারিদ্র্য ছাড়া?

সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় দীর্ঘায়িত চলমান অপশাসনের বিরুদ্ধে, জনগণের ওপর যে সকল নিপীড়নমূলক আইন, বিশেষত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (পরবর্তীতে আমাদের আন্দোলন ও জনরোষকে বিপথগামী করতে সাইবার নিরাপত্তা আইন), অত্যাব্যশ্যক পরিষেবা বিলের নামে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাসে সরকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে দায়ী বাজার সিডিকেটকে সরকারের কার্যত পৃষ্ঠপোষকতা, সারা দেশে গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা জারি-সারি, পালাগান, বাউল গান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এক ধরনের অবরোধ ও সংকুচিত করে পশ্চাদপদ মৌলবাদী গণবিরোধী শক্তির তোষণ-পদলেহণ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিপরীতে জাতির ক্রান্তিকালে জনগণের সপক্ষে আমাদের মতপন্থের ও সাংগঠনিক নানা রকম মতবৈধ সত্ত্বেও একটি যুথবদ্ধ সাংস্কৃতিক লড়াই আমাদের এগিয়ে নিতে হবে। সাংগঠনিক ও নানা রূপ মতাদর্শিক ও কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতাকে নিয়েই আমরা একসাথে চলতে চাই, এগুতে চাই।

সমবেত ভাইবোনেরা,

আজ একথা তো পরিষ্কার, দিনের ভোট রাতে করে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারের পুনরায় আয়োজিত একটি নির্বাচনী তামাশা জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর সরকারি জুলুম-গুম, খুনের

ঘটনার পর এ সরকারের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি কোনো বিবেকবান মানুষের থাকার সুযোগ নেই। জনগণ এ সরকারের বিদায়ের জন্য অধীর অগ্রহে অপেক্ষা করছে। জনগণের এ আকাঙ্ক্ষায় আমরা সহযাত্রী ও বন্ধু হতে চাই।

আমরা উদ্যোগ নিয়ে বেশকিছু দিন যাবৎ ৩১টি প্রতিবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন একসাথে কাজ করছি। এ উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারিত করা একই সাথে আরও গতিশীল করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। আমরা সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়তার জন্য বিভিন্ন বামপন্থি দল ও জোটের সাথে কথা বলেছি, বৈঠক করেছি। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সাথে যেমন বৈঠক করেছি, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম ঐক্যের সাথেও বসেছি, বৈঠক করেছি। তারা প্রত্যেকেই আমাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিশেষত সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তথাকথিত সাংস্কৃতিক 'আইডল'দের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও দালালির বিপরীতে আমাদের পদক্ষেপকে এগিয়ে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। বেশি খুশি হয়েছি বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বামমোর্চার নেতৃবৃন্দকে সাধারণত একসাথে এক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ ও কর্মসূচির অনুষ্ঠানগুলোতে উভয় জোটসহ অন্যান্য প্রগতিশীল, বাম ব্যক্তিত্ব, জোট ও দলের নেতৃবৃন্দকে সশরীরে হাজির থাকতে দেখেছি। আমাদের উৎসাহ ও মনোবল তাতে অনেক বেড়ে গেছে।

শুধু তাই নয় আমাদের এ লড়াই চলাকালেই আরও একাধিক একই ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তকগণও বর্তমান শাসকদের সৃষ্ট অগণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও সমাবেশ করতে শুরু করেছেন। আমরা তাদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও যোগাযোগ অব্যহত রাখছি। আমরা সরকার বিরোধী বিভিন্ন 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' এবং জনগণের জন্য বিভিন্ন পক্ষের আন্দোলন সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণ অব্যহত রাখছি।

সংস্কৃতিকর্মীদের কোনো আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না, যদি রাজনৈতিক আন্দোলন তার সহায়ক ভূমিকা পালনে সমর্থ্য না হয়। তাও নির্ভর করে আন্দোলনে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও মেহনতি শ্রেণির যথার্থ নেতৃত্বমূলক অংশগ্রহণের ওপর। আমরা আশাবাদী হতে চাই আমাদের বাম ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণকে দিশা দিতে সমর্থ্য হবে, সংস্কৃতিকর্মীগণও পাশাপাশি জনগণের সমস্যা ও সংকটে পাশে থাকবে—আমরা সংস্কৃতিকর্মীগণ জনগণকে সে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই।

আসুন, এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণের মনে আশা সঞ্চারের জন্য মেহনতি মানুষের সহযাত্রী হয়ে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে शामिल হই। আসুন, গণমানুষের সপক্ষে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলি। সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মহিলা ফোরামের মতবিনিময়

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ভারতীয় প্রোগ্রেসিভ উইমেন এসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কমরেড চন্দ্রাপিত্তা চৌধুরী, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলরুবা নূরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, বাংলাদেশ নারীমুক্তি পরিষদের সভাপতি শবনম হাফিজ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ তাদের দেশের নারী আন্দোলন, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন, সাংগঠনিক অবস্থা, নিজেদের আন্দোলন সংগ্রামের অভিজ্ঞতাসহ সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম আয়োজিত তিন দিনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

ব্যাটারিচালিত যানবাহন চালকদের মিছিলে হামলা ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নিন্দা

উচ্ছেদের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায়
প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত

রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা,
ভ্যান-ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের মিছিলে পরিকল্পিত হামলা ও ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে ফকিরবাড়ি রোডে অবস্থিত জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়কারী ডা. মনীষা চক্রবর্তী, রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান-ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি দুলাল মল্লিক ও শহিদুল হাওলাদার, বিজন শিকদারসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স, ট্রাফিক মামলার হয়রানি কমানোসহ নানাবিধ দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধারাবাহিকভাবে গত ১২ বছর আন্দোলন করছে। আন্দোলনকারীদের প্রশাসন, ক্ষমতাসীন দলের নানাবিধ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, পুলিশি হয়রানি, মামলা-

হামলার শিকার হতে হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে ৪ দফা দাবিতে রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন নস্যাত করতে মিছিলে মোটরসাইকেল, সিএনজি গাড়ি চুকিয়ে দেয়া হয়। সংগ্রাম পরিষদ মিছিলে হামলা ও ভাংচুরের সাথে জড়িতদের শাস্তি চেয়ে বিবৃতি দেয়। জানা যায় গ্যাসচালিত তিন চাকার যানবাহনের একটি সংগঠন প্রশাসনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নেয়। ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ করে যারা নিজেদের তিন চাকার সিএনজি ব্যবসার প্রসার করতে চায় এটা তাদের চক্রান্ত।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রশাসন দিয়ে হয়রানি, হামলা করে, মামলার ভয় দেখিয়ে তারা সফল হবে না। বরং এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষুব্ধতা বাড়বে এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের অধিকারের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং চক্রান্ত করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে বলে সাবধান করে দেন।



খুলনা

ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান উচ্ছেদ এবং গ্যারেজে হয়রানি বন্ধ করা, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাটারিচালিত রিকশার লাইসেন্স প্রদান করা, বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা রিকশার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত ডিজাইন প্রণয়ন করা এবং সেই ডিজাইনের রিকশা নির্মাণ করার জন্য উপযুক্ত সময় দেয়া, প্রয়োজনে অফিস চলাকালীন নগরীর প্রধান ২/৩টা সড়ক চিহ্নিত করে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই সময়ে শুধুমাত্র সেসব রাস্তায় এক পাশ থেকে আরেক পাশে রিকশা পারাপার হতে দেয়া ও বাকি সব রাস্তায় রিকশা চলতে দেয়া, আটককৃত সকল রিকশা ব্যাটারি ও মোটরসহ ফেরত দেয়া প্রভৃতি দাবিতে

১৩ ফেব্রুয়ারি খুলনা নগরীর ডাকবাংলা ফেরিঘাট মোড়ে শ্রমিক সমাবেশ করেছে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ এবং রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন খুলনা মহানগর কমিটি। সংগঠনের খুলনা মহানগর কমিটির আহবায়ক আলমগীর হোসেন বাবুর সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব এস এম চন্দনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহানগর কমিটির আহবায়ক এইচ এম শাহাদাৎ, সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব জনার্দন দত্ত নান্টু, শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এস এ রশীদ, কোষাধ্যক্ষ কোহিনুর আক্তার কণা, সদস্য আব্দুল করিম, মানিক মিয়া, হারুনুর রশিদ, রিকশা শ্রমিক নেতা আবু সাঈদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, আব্দুল আলিম, আমির হোসেন, আলমগীর হোসেন, মো. ইয়াসিন, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।



বরিশাল

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা ব্যাটারিচালিত রিকশাকে আধুনিকায়নের জন্য ডিজাইন করা এবং রেজিস্ট্রেশন ও চলাচলের নীতিমালা করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে 'প্রি-ইলার ও সমাজতান্ত্রিক মোটরযানের সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১' নামে একটি খসড়া নীতিমালা করেছে যা চূড়ান্ত হবে। মাননীয় হাইকোর্টের আপিল বিভাগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ মহাসড়ক ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে ব্যাটারিচালিত তিন চাকার বাহন চলতে দেয়ার ব্যাপারে রায় দিয়েছে।

এক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিলে সারাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের নিরাপদ কর্মসংস্থান হবে। আমরা আরও মনে করি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিবন্ধন, রুট পারমিট, লাইসেন্স দেয়ার ব্যবস্থা চালু হলে সড়কে শৃঙ্খলা-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এর ফলে সরকার পাবে রাজস্ব, সড়কে আসবে শৃঙ্খলা আর চালক-মালিকরা পাবে স্বস্তি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি '২৪ সংসদে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও রিকশা চলাচল বন্ধ করাসংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'এই ৪০ লাখ প্রিইলারকে আমি বলি—বাংলার টেসলা।' (উল্লেখ্য টেসলা

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় বৈদ্যুতিক গাড়ি)।, নসরুল হামিদ আরও জানান, কত দ্রুত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে ইলেকট্রিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সে জন্য সারা বিশ্বে একটা বিপ্লব চলছে। তিনি বলেন, 'আমরা তাদের কোনো বাধা দিচ্ছি না। যান্ত্রিকভাবে এতে ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু বিদ্যুৎ যেটা ব্যবহার করছে, তার রিটার্ন অনেক বেশি।...এ ক্ষেত্রে লেড ব্যাটারি থেকে তারা যেন লিথিয়াম ব্যাটারিতে চলে আসে। এটা নিয়ে আমরা একটা প্রকল্প করছি। আমরা লেড ব্যাটারি নিয়ে তাদের লিথিয়াম ব্যাটারি প্রদান করব।'

প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার যদি ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অটোরিকশাকে দেশে দ্রুত চালু উৎসাহিত করতে চায়, তাহলে আজও এগুলোর চলাচলকে 'আইনগতভাবে অবৈধ' করে রাখা হয়েছে কার স্বার্থে?

নেতৃবৃন্দ বলেন, ট্রাফিক পুলিশের ঘৃণ-দুনীতি এবং চাঁদাবাজদের স্বার্থে কি অবৈধ রাখার অযৌক্তিক আইন বহাল রাখা হচ্ছে?

নেতৃবৃন্দ ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান উচ্ছেদ বন্ধ ও চালকদের হয়রানি বন্ধের দাবি জানান এবং চলাচলের নীতিমালা করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

সিলেট

সিলেট মহানগর ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক ব্যাটারিচালিত যানবাহনের মটর-ব্যাটারি খুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, আটক-হয়রানির, চাঁদাবাজি বন্ধ ও লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং রিকশা-ব্যাটারি রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি শহরের হাজার হাজার শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিল ও শহিদ মিনারের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও রিকশা-ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও

ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ মহানগর শাখার সভাপতি প্রণব জ্যোতি পালের সঞ্চালনায় সংহতি জানান সংগ্রাম পরিষদের শহীদ মিয়া, ইয়াছিন আহমদ, আনোয়ার হোসেন, মোহসিন আহমদ, মনজুর আহমদ, বেলাল হোসেন, ইউসুফ আলী, তুহিন আহমদ, বিলাল আহমদ, আমির হামজা, জামাল উদ্দিন, মিজান রহমান, তাজুল ইসলাম, টুনু বাবু, আসলাম উদ্দিন, অভি ইসলাম, নুরুল ইসলাম, সেলিম আহমদ, দিনাজ আহমদ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ সরকার ও ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন, ব্যাটারিচালিত যানবাহন নির্বিল্পে চলাচলের ব্যবস্থা করুন, চালকদের হয়রানি করবেন না। এরা স্ব কর্মসংস্থান করে নিজেরা বাঁচে, দেশকে সমৃদ্ধ করে।

১৫ বছরে ১৪ বার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি : জনগণের কাঁধে আর কত বোঝা চাপবে?

জনগণের মতামতের তোয়াফা না করে এবং অতীতের মতোই সেই ব্যয় বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হলো। ঘোষণা দেয়ার পর দাম বৃদ্ধি কার্যকর করা নয় বরং কার্যকর করেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম সাড়ে ৮ শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ২৯ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তার ঘোষণা অনুযায়ী, বিদ্যুতের দাম পাইকারিতে বাড়বে ৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। অর্থাৎ পাইকারির প্রতি ইউনিটের গড় দাম ৬ টাকা ৭০ পয়সা থেকে বেড়ে হবে ৭ টাকা ৪ পয়সা। আর খুচরা পর্যায়ে দমে বাড়ানো হবে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এর ফলে খুচরা প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় দাম ৮ টাকা ২৫ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৮ টাকা ৯৫ পয়সা। মাসের শেষে গ্রাহকের উপর কি বোঝা, আর সামগ্রিক অর্থনীতির উপর কতখানি চাপ পড়বে তা নিয়ে আলোচনা হলে তাতে কিছু আসে যায় না, সরকার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আধুনিকতা এবং উন্নয়নের সাথে বিদ্যুতের ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোন দেশ কত উন্নত তা বুঝার অন্যতম মাপকাঠি সে দেশের জনগণের মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার। আজকের বিশ্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যুৎ নির্ভর। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার, বিদ্যুতের আবিষ্কার, কম্পিউটারের আবিষ্কার পরবর্তীতে এখন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে সেখানে বিদ্যুৎ হলো প্রধান নিয়ামক শক্তি। এই বিদ্যুৎ কি কয়লা, গ্যাস-তেলসহ জীবাশ্ম জ্বালানি, পারমাণবিক শক্তি নাকি পানি, সৌর, বাতাসের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা উৎপাদিত হবে তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক থাকলেও বিদ্যুৎ যে প্রয়োজন তা নিয়ে বিতর্ক নেই।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্য নিয়ে সরকারি মহলে আত্মতৃপ্তি আছে। সরকারি হিসেবে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট সক্ষমতা ২৬ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। কিন্তু সক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন কিন্তু অনেক কম। যখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ অর্থাৎ গ্রীষ্মে উৎপাদন করা হয় ১৩ থেকে ১৫ হাজার মেগাওয়াট আর শীতে সেটা নেমে আসে ৮ থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াটে। এ যাবতকালে দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে গত বছরের ১৯ এপ্রিল, সেদিন উৎপাদন হয়েছিল ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। যে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহার করার ধরনটা বিবেচনা করলে দেখা যায়, মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ৪২ শতাংশ গ্যাস, ২৪ শতাংশ ফার্নেস তেল ও ১৭ শতাংশ কয়লাভিত্তিক। বাকি যে পরিমাণ বিদ্যুৎ তারমধ্যে আমদানি করা বিদ্যুৎ ১১ শতাংশ এবং ডিজেল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৩ শতাংশ করে।

এই যে প্রয়োজনের দ্বিগুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা তার ফলাফল কী? দেখা যাচ্ছে সারা বছরই বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ অলস থাকে। কিন্তু বসে থাকলেও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে চুক্তি অনুযায়ী বিপুল অঙ্কের কেন্দ্র ভাড়া দিতে হয়, যা ক্যাপাসিটি চার্জ নামে পরিচিত। বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশ্লেষণ বলছে, গত বছর সক্ষমতার ৪১ শতাংশ অলস ছিল। এদিকে গত অর্থবছরে ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ দিতে হয়েছে। যা তার আগের বছরে ছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরেই বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা।

তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অন্য জ্বালানির তুলনায় তিন গুণের বেশি। তবু

সারা বছরই তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সরকার। বসে থাকছে গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার বড় একটি অংশ।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্র বলছে, ফার্নেস তেলভিত্তিক কেন্দ্র থেকে এখন ১ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে জ্বালানি খরচ গড়ে ১৭ টাকা। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ দাঁড়ায় চার টাকার আশপাশে। কয়লা ব্যবহার করলে ব্যয় দাড়ায় ছয় টাকার মতো। এই হিসাব জানা সত্ত্বেও বেশি ব্যয় করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বিদ্যুতের ২৩ শতাংশ উৎপাদন করা হয়েছে তেল ব্যবহার করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় ২৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি ইউনিট ১১ টাকা ৫২ পয়সায়। একটা হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন যদি ১০ শতাংশ কমিয়ে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাহলে বছরে সাশ্রয় হতে পারে অন্তত ৯ হাজার কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞদের কথা না হয় বাদ দেয়া যাক। স্বয়ং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, চাহিদামতো গ্যাস পেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে। আমদানি করে গ্যাস দিলেও খরচ অনেক কমবে। তিনি আরও বলেছেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও খরচ অনেক কমেছে। কিন্তু গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পুরো সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না। তার এই বক্তব্য শুনে কেউ কী জানতে চাইতে পারে যে, কেন বিদ্যুৎকেন্দ্র পুরো সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না? তিনি কি উত্তর দিতে বাধ্য? অথবা সমাধানের পথ জানা থাকলেও সে পথে তারা না হাঁটার কারণে যে ব্যয় বৃদ্ধি হলো, রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হলো, জনগণকে বিদ্যুতের জন্য বর্ধিত মূল্য দিতে হলো তার দায় কে নেবে?

অন্যদিকে সাধারণ জনগণ সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও বিদ্যুৎ খাতে বিপুল অঙ্কের অর্থ বকেয়া। এই বকেয়া রেখেছে কারা? গ্যাস ও কয়লা কিনতে গিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে যেসব দেনা সেগুলোও পরিশোধ করতে পারছে না সরকার, সে কারণেই গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পুরোদমে চালানো যাচ্ছে না। তাই প্রতিমন্ত্রীর যুক্তি করেছেন, বাধ্য হয়েই তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে হচ্ছে। ভর্তুকি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ এবং আমদানির জন্য মার্কিন ডলার পাওয়া গেলে গ্যাস ও কয়লা আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো যাবে। এই কথায় বুঝা গেল, বিদ্যুতে ভর্তুকির যে কথা বলা হয়েছে সেই টাকাও বিদ্যুতখাতে দেয়া হয়নি। এ এক অদ্ভুত যুক্তির গোলক ধাঁধা। ভর্তুকি দিতে হয় বলে সরকারের উপর চাপ পড়ে, চাপ কমাতে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় কিন্তু আবার যে টাকা ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ থাকে, সেটা পরিশোধ করা হয় না। আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় ডলার পাওয়া যাচ্ছে না, এর জন্য দায়ী কারা? উত্তর জানা থাকলেও দায় নেবে কে?

কয়লা কেনা গেল না, গ্যাস কেনা গেল না ডলারের অভাবে। সমাধান হিসেবে জ্বালানি তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কিন্তু সহজ প্রশ্ন তো যে কেউ করতেই পারেন, জ্বালানি তেল আমদানি করতে কী ডলার লাগে না? তাহলে সেই ডলার দিয়ে গ্যাস ও কয়লা আমদানি করা যায়নি কেন? তাহলে কি সেই সন্দেহ সত্যি হলো যে, বেসরকারি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে সুবিধা দেয়ার জন্য সেগুলো থেকে বিদ্যুৎ কেনা হয়। এবং এই কারণে সরকারি ফার্নেস তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও কম চালিয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জানা

গেছে এসব কেন্দ্রে সক্ষমতার মাত্র ১২ থেকে ১৪ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে বেসরকারি ফার্নেস তেলচালিত কেন্দ্রের সক্ষমতা ব্যবহার করা হয় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। সরকার নিজেই সরকারি (পিডিবি মালিকানাধীন) কেন্দ্র থেকে কম বিদ্যুৎ কিনে থাকে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে কিন্তু ফলাফল বুঝতে সময় লাগে না। ভোক্তাদের বিদ্যুতের জন্য বেশি দাম দিতে হবে এটাই সহজ সমাধান।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এম শামসুল আলম ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০২২ সালে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গণশুনানিতে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলাম, বিপিসি (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন) যে দামে ফার্নেস তেল আমদানি করে, তার চেয়ে প্রতি লিটারে ১৮ টাকা বেশি দর দেখিয়ে বিল নেয় বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। এতে বাড়তি ব্যয় আট হাজার কোটি টাকা। এই ব্যয়ের কারণেই ফার্নেস তেলভিত্তিক কেন্দ্র চালানো হয়। উচ্চ ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে বাড়তি দাম সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে। এর দায় কার আর ব্যয়ের বোঝা চাপানো হয় কাদের কাঁধে?

গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ৮৭ হাজার ২৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। সরকারি, বেসরকারি ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে এ পরিমাণ বিদ্যুৎ কিনতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯৫ হাজার ৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ পরিশোধ করতে হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। কিন্তু এ সময় ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ব্যয় বেড়েছে ৫৬ শতাংশ। বিদ্যুৎকেন্দ্র বসে থাকা বা কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও এই ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়।

এই বাড়তি উৎপাদন সক্ষমতা সত্ত্বেও চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও অন্তত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্রও রয়েছে। মোট সক্ষমতায় এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র যুক্ত হলে চলতি অর্থবছরে ক্যাপাসিটি চার্জ বেড়ে ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা খাতসংশ্লিষ্টদের। ফলে লোকসানের দোহাই দিয়ে আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পথ উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। সরকার বলছে তারা ভর্তুকির বোঝা কমাতে চায় তাই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় যদি বাড়তেই থাকে ক্যাপাসিটি চার্জের জন্য বেশি টাকা দিতে হয় তাহলে দাম বাড়িয়েও কি লোকসান দূর করা সম্ভব হবে?

বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিপিডিবি সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ ক্রয়ে গত অর্থবছর বিপিডিবি ব্যয় ছিল ৯৫ হাজার ৩১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ ছিল ২৬ হাজার ২০০ কোটি টাকার মতো (প্রাক্কলিত)। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ক্রয়ে বিপিডিবি ব্যয় হয়েছিল ৭১ হাজার ৪৯৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা। ওই অর্থবছরে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ ছিল ১৬ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক অর্থবছরের ব্যবধানে সংস্থাটির ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ব্যয় বেড়েছে ৫৬ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে বেসরকারি ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হয়েছে বিপিডিবিকে। আইপিপি ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে বিপিডিবি বিদ্যুৎ ক্রয়ে ব্যয় বাড়ায় বিপিডিবি গড় উৎপাদন

ব্যয়ও ৮ টাকা ৮৪ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৩৩ পয়সায়।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ খাতে অনাবশ্যক উৎপাদন বৃদ্ধি, জ্বালানি আমদানি ব্যয়, প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যুতের চাহিদা না বাড়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়া সবগুলোই এ খাতের ভুল পরিকল্পনার মাশুল। এর জন্য দায়ী সরকার ও আমলা, এর ফলে সুবিধা পেয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীরা আর বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে জনগণকে।

আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কথা ভাবলে এটা তো ঠিক যে সক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন কম, সেহেতু কম ব্যয়ের জ্বালানি ব্যবহার করে উৎপাদন করার পরিকল্পনাই হতো লাভজনক। কিন্তু তারপরও চালানো হচ্ছে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। পিডিবি হিসাবে, গত অর্থবছরে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫২ শতাংশ গ্যাস থেকে, ২৩ শতাংশ তেল থেকে, প্রায় ১২ শতাংশ কয়লা থেকে, ১১ শতাংশ আমদানি থেকে ও ২ শতাংশ এসেছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ছাড়াই বর্তমানে উৎপাদন সক্ষমতা আছে ২০ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা সাড়ে ১১ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি সূত্র অনুযায়ী, বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের চাহিদা দিনে প্রায় ২৩২ কোটি ঘনফুট। কিন্তু এখন সরবরাহ করা হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫ কোটি ঘনফুট। গত গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ১২০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা হয়েছিল। ওই সময় সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে গ্যাস থেকে। প্রায় অর্ধেক সক্ষমতা বসিয়ে রাখতে হয়েছিল গ্যাসের অভাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাস, কয়লা ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র চালালে উচ্চ ব্যয়ের তেলভিত্তিক কেন্দ্র চালানোর প্রয়োজনই হয় না। এতে ব্যয় অনেক কমে যাবে। দেশে আরও গ্যাস উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে। সেই প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দ্রুততম সময়ে গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানো দরকার। তাহলে ডলারের ওপর চাপও কমবে। এদিকে বিশ্ববাজারে গ্যাস ও কয়লার দামও কমেছে। ২০২২ সালে খোলাবাজারে যে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) দাম উঠেছিল ৬০ ডলারে, তা এখন ১০ ডলারের আশপাশে (এমএমবিটিইউ)। ৪০০ ডলারের কয়লা নেমেছে টনপ্রতি ৮০ ডলারের নিচে। জ্বালানি তেলের দামও কমেছে। তারপরও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো প্রমাণ করে এই সরকার জনগণের প্রতি কতটা দায়হীন।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে। শিল্প পণ্য উৎপাদন, কৃষি পণ্য উৎপাদনসহ বিদ্যুৎ দিয়ে যা কিছু উৎপাদন হয় সবকিছুরই দাম বাড়বে। জনগণের জীবনমানে পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। সরকার বাড়ালো দাম, বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীরা পেল মুনাফা, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও তাদেরকে দেয়া হলো ক্যাপাসিটি চার্জ, আর জনগণের কাঁধে চাপানো হলো বর্ধিত দামের বোঝা। সমন্বয় করার নামে গত ১৫ বছরে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে কিন্তু আয়-ব্যয়ের সমন্বয় হলো না কেন? এই প্রশ্নে জবাব কে দেবে? দায়হীন লুণ্ঠনের বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণকেই বহন করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আগাম জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো আগামী তিন বছর আমরা এটাকে (বিদ্যুতের দাম) সমন্বয় (বাড়ানো হবে) করব। মুষ্টিমেয় আমলা, বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী আর তাদের স্বার্থরক্ষাকারি সরকার এই তিনে মিলে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়ায়। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাই সকল গণতন্ত্রকামি মানুষের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম অত্যাৱশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই শক্তিশালী করুন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

নমুনা আমরা দেখি আফগানিস্তানে কিংবা ইরানে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আফগান মৌলবাদীরা নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ করেছে। ইরানে মাশা আমিনির ঘটনা সবাই জানেন। স্কার্ফ ঠিকমত পরিধান না করায় নীতি পুলিশ তাকে পিটিয়ে হত্যা করল এবং পরে এর প্রতিবাদ করায় প্রায় ৫০০ মানুষকে গুলি করে হত্যা করল, যার মধ্যে ৬৯ জন শিশু। বিক্ষোভে অংশ নেয়ায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করেছে। এই ধর্মীয় মৌলবাদী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে বিস্তারিত ব্যবধান। একদল প্রাচীনপন্থি আরেকদল আধুনিক কিন্তু তাদের মধ্যে চমৎকার মিলও রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কর্তৃত্বের ব্যাপারে। এই সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও; ফলে মৌলবাদী ও পুঁজিবাদীরা একই মানসিকতা পোষণ করে। উভয়েই মেয়েদেরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই ধরে নেয়।

এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে যুদ্ধ লাগাচ্ছে। যুদ্ধে মানুষ মারা যায়, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রবল হয়, যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার হতে হয় নারী ও শিশুদের। প্রায় ৫০ বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। তাতে সমর্থন দিয়ে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা জোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। গাজায় চলমান যে গণহত্যা সেখানে প্রায় ২৬ হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে যার অর্ধেকের বেশিই নারী এবং শিশু। একইভাবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও চরম নৃশংসতার শিকার হতে হচ্ছে নারীদের। এছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশে স্থানীয়ভাবে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদীরা। এর মাধ্যমে তাদের বাজার সম্প্রসারণ ঘটে, বিস্তৃত হয় অস্ত্র ব্যবসা। লেনিন যেমন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ যত দিন থাকবে, যুদ্ধ তত দিন থাকবে। তাই এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ এবং তার বীভৎসতা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই।

১৯১৭ রাশিয়ায় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবের পর থেকেই রাশিয়া নারী-পুরুষের বৈষম্য সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে একের পর এক ভূমিকা নিয়েছিল। নারীদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভোটাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছিল রাশিয়া। সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছিল পতিতাবৃত্তি। নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন বিলোপ করা হয়েছিল, নারীর অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল, জমির উপর মালিকানা স্বত্ত্ব সমানঅধিকার দেয়া হয়েছিল। সেই সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল চার্চের কর্তৃত্ব ও অনুশাসন। বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের সাথে চার্চের সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো। নারীকে গর্ভপাতের অধিকার দেয়া হলো। দুইজনের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ে করার পদ্ধতি চালু করা হলো। সকল শিশুই রাষ্ট্রের দায়িত্বে প্রতিপালিত হবে এমন বিধান করা হলো, অবৈধ শিশু বলে কিছু থাকল না। স্বামীর পদবি গ্রহণ করার কোন আইনি বিধান থাকল না। সকল স্তরে নারীর কাজ ও সম-মজুরির অধিকার স্বীকৃত হলো। গৃহস্থালির শ্রমকে সামাজিক শ্রমে পরিণত করা হলো। সেই সময়ে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস করা হলো। অন্যান্য পেশার পাশাপাশি কৃষি, ভারী শিল্প, ভবন নির্মাণ ইত্যাদি নানা কাজে নিয়োজিত হলেন রাশিয়ান নারীরা। মহাকাশ অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন সোভিয়েত নারীরা। এভাবে নারীদের জীবনের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। লেনিনের একটি বক্তব্যে আমরা এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সারমর্ম বুঝতে পারি। লেনিন বলেছেন, ‘আমরা সাধারণ রান্নাঘর, যৌথ রন্ধনশালা ও আহার গৃহ, ধোপাখানা ও মেরামতের দোকান, শিশু বিদ্যালয়,

কিন্ডারগার্টেন, শিশু প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। সংক্ষেপে আলাদা আলাদা ঘরকন্নার অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মগুলিকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করার পদক্ষেপ আমরা গুরুত্বের সাথে কাজে পরিণত করছি। তার অর্থ দাঁড়াবে সাবেকি ঘরকন্নার একঘেয়েমি থেকে ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থেকে নারীদের মুক্তিলাভ। তার দ্বারা নারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও অগ্রহ কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে’। এভাবেই নারীদেরকে কেবল গৃহস্থালির কাজ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষে পরিণত করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছিল সমাজতন্ত্র।

পুঁজিবাদ নারীকে পণ্যে পরিণত করে আর সমাজতন্ত্র নারীকে মর্যাদার জীবনের সন্ধান দেয়। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নারীর মুক্তি অসম্ভব। যেমন পুঁজিবাদ কখনোই শ্রমিকের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে না তেমনই নারীর অধিকারের স্বীকৃতি এখানে পাওয়ার আশা করা দূরশা মাত্র। নারীর মূল শত্রু পুঁজিবাদ। নারীদের সমস্যার সমাধান তাই পুঁজিবাদে নেই, আছে সমাজতন্ত্রে। নারীর পূর্ণ মুক্তি এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব তখনই যখন মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান হবে। কেবলমাত্র তখনই মানবজাতির চরম উন্নতি সাধিত হবে। তখনই মানুষ পৌঁছবে তার যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন সাধনার ‘স্বর্ণ যুগে’। চিরদিনের মতো অবসান হবে এক শ্রেণির দ্বারা অন্য শ্রেণির উপর প্রভুত্ব এবং তার সঙ্গে অবসান হবে নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম মানুষ মুক্ত স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাস করতে পারবে, তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই সচেতনভাবে তাদের সমস্ত পথই নির্দিষ্ট করতে পারবে। ইতিপূর্বে কখনোই মানুষ সচেতনভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। উৎপাদন-বন্টনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্ত নিয়মকানুন ছিল অজ্ঞাত। নতুন সমাজে মানুষ সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে সচেতনভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হবে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনই বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই মানুষকে সকল রকম আধিপত্য ও শোষণের কবল থেকে মুক্ত করবে। সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়াই এখন সময়ের দাবি। দুনিয়ার ইতিহাসে নিপীড়িত শ্রেণির ভূমিকা ছাড়া কোন আন্দোলনই সফল হয় নাই। আর নারীরা হলো নিপীড়িতদের মধ্যেও সবচেয়ে নিপীড়িত। তাই নিপীড়িত জনতার সর্বাঙ্গিক মুক্তি আন্দোলনে আজকের দিনের নারী আন্দোলন একান্ত হতে হবে। গৃহকর্মী থেকে গার্মেন্টস, কৃষি ক্ষেত্র সর্বত্র অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। বৈষম্যের মূল কারণ পুঁজিবাদী শোষণ আর বৈষম্য রক্ষার হাতিয়ার মৌলবাদী মানসিকতা এই দুইয়ের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম আজ সময়ের দাবি। নারীরা লড়াইে দুনিয়ার সর্বত্র সেই লড়াইয়ে একাত্ম হতে হবে বাংলাদেশের নারীদেরকেও। এ ক্ষেত্রে মহিলা ফোরামকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজতন্ত্রই নারী মুক্তির একমাত্র পথ স্লোগানে প্রকম্পিত করে সারা দুনিয়াব্যাপী নারী আন্দোলন গড়ে উঠবে আজকের এই সমাবেশ থেকে সেই প্রত্যাশাই করি।

শম্পা বসু বলেন, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক লড়াই-সংগ্রামের দিন। আমরা যখন ১১৪তম নারী দিবস পালন করছি, আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের যখন ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে, সেই সময় বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজ কেমন আছে? কমরেড মাও সেতুং বলেছিলেন, ‘নারী হচ্ছে অর্ধেক আকাশ’। সেই অর্ধেক আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৬ লাখ। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ২ কোটি ৫৪ লাখ। তারমানে শ্রমশক্তির



ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানে সমানে নেই। নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে, টিকে থাকতে বাধার পর বাধা পেরোতে হয়। নারীকে যেভাবে পরিবার-সংসার, সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয়, যেভাবে গৃহস্থালি কাজ করতে হয়, সেভাবে তারা মূল্যায়ন পান না। আমাদের দেশে গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য রাষ্ট্রীয়ভাবে হিসাব করা হয় না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গৃহস্থালি কাজের কোনো স্বীকৃতি মেলে না। কর্মক্ষেত্রেও নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয় নারী।

৮ মার্চের আন্দোলনে দাবি উঠেছিল নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের শ্রমজীবী নারীদের ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, তারা প্রায় প্রত্যেকেই মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। আমরা বলছি না যে, পুরুষ শ্রমিকরা ন্যায় মজুরি পান কিন্তু কেবলমাত্র নারী হওয়ার জন্য নারী শ্রমিকরা মজুরি কম পাচ্ছেন। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপ্তির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের তিন ভাগের মাত্র একভাগ আইনি অধিকার ভোগ করেন। বাংলাদেশের নারীরা আইনতই বৈষম্যের শিকার হন। আমাদের দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবেন। কিন্তু আমাদের পারিবারিক আইন ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্বের বিষয়ে নারীরা বৈষম্যের শিকার হন। কর্মক্ষেত্রে ৮৪ শতাংশ ও গণপরিবহণে ৯৪ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীকে নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে সকল আইন আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন আমরা তেমন দেখতে পাই না। ধর্ষণ আইনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে ১০০টি ধর্ষণ মামলার মধ্যে ৯৭টিরই কোন ধরনের বিচার হয় না।

পুঁজিবাদে নারী দ্বৈত শোষণের শিকার; একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণ আর একদিকে পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। ফলে এখানে নারীর শ্রম সন্তা আর নারীর দেহও পণ্যে পরিণত। বেসরকারি হিসাব মতে, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০ হাজার নারী পাচার হয়ে যায় বিভিন্ন দেশে; বিভিন্ন দামে তাদেরকে বিক্রি করা হয়।

আমাদের দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সমাজকে দুটো চাকার একটি গাড়ির সাথে তুলনা করেছেন এবং সেই চাকার একটি নারী একটি পুরুষ। গাড়ির একটি চাকা যদি ছোট হয়, গাড়িটি সামনে এগোবে না। তেমনি নারীকে পিছিয়ে রেখে সমাজের অগ্রযাত্রা সচল রাখা সম্ভব নয়।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চেতনার মূলে ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই; শোষণহীন

সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই ৮ মার্চের চেতনাকে ধারণ করে নারী আন্দোলনকে শ্রেণি চেতনার সাথে যুক্ত করে সকল ধরনের অন্যায় শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার আহ্বান জানাই।

কমরেড গাবি ফেচনার বলেন, তিনি একটা মেটাল কারখানার শ্রমিক ছিলেন, সেখান থেকে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি এমএলপিডি প্রধান মানুষ হিসেবে পার্টি পরিচালনা করতেন। আজকে নারী দিবস পালন করতে গিয়ে আমাদের নারী দিবসের ইতিহাসও সংরক্ষণ করতে হবে। নারী দিবসের ইতিহাসের শিকড় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। সংগ্রামের স্মারক হচ্ছে নারী দিবস। এখন বুর্জোয়ারা এ দিবসের ইতিহাস বিকৃত করে একে উৎসবে পরিণত করেছে। তার বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের যে আন্দোলন হয়েছে তারা জার্মান থেকে সে আন্দোলন দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এখানে শ্রমিকদের হত্যা করেও আন্দোলন থামানো যায়নি। শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে রাস্তায় ছিল। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের শক্তি হচ্ছে



গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকরা। তিনি শ্রমিকদের আন্দোলনকে অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন সমাজতন্ত্র ছাড়া নারীমুক্তি সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নারীর সত্যিকার মুক্তি সম্ভব। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনকে ধ্বংস করেছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছে, পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আজকে একদিকে সারা পৃথিবীতে পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে আরেক দিকে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এই দুই বিষয়ই নারীদের জন্য হুমকি স্বরূপ। নারী মুক্তি অর্জন করতে হলে সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ভারতেও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বাড়ছে। নারীদের শুধুমাত্র মজুরি সমতার লড়াইয়ে মুক্তি আসবে না, একটা সমতার সমাজ—শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীদের ক্ষমতাহরণের লড়াই ও করতে হবে। এমএলপিডি নারী নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যে কারণে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫০ শতাংশের বেশি নারী সদস্য রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন সামনের দিনে মহিলা ফোরামের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় থাকবে।

কমরেড আং দাওয়া সেরপা বলেন, ৮ মার্চ শুধুমাত্র নারী দিবস পালন নয়, এটা হচ্ছে সমতার পৃথিবী প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই। আমাদের মায়েরা, কন্যারা, শিশুরা একটা সমতার পৃথিবী পাবে, মর্যাদা পাবে। নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হয়েছিল, সেখানে মাওবাদীরা কমরেড প্রচন্ডের নেতৃত্বে একটা দুর্ধর্ষ লড়াই করেছিল। এই লড়াইয়ে বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে নতুন

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাপন ব্যয় বাড়ছে : কী কাটবে আর কোনটা ছাঁটবে?

জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে যদি আয় না বাড়ে তখন সাধারণ কাগজজানে মানুষ ভাবে, কেনাকাটায় কিছু কাটছাঁট করতে হবে। কিন্তু কোনটা কাটবে আর কোনটা ছাঁটবে তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায় সীমিত আয়ের মানুষেরা। দামের ওঠানামার সঙ্গে সাধারণভাবেই বলা হয়, চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক আছে। চাহিদা বেশি, জোগান কম তাহলে দাম বাড়বে আর জোগান বেশি, চাহিদা কম তাহলে দাম কমবে এটা তো পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয়। কিন্তু চাহিদা আছে, জোগানও আছে অথচ দাম বাড়ছেই ক্রমাগত, তখন কী হবে? যদি পাল্লা দিয়ে আয় বাড়ে তাহলে সমস্যা নেই কিন্তু আয় না বাড়লেই নানা সমস্যা। কপালে পড়তে থাকে দুশ্চিন্তার ভাঁজ, চড়তে থাকে মেজাজের পারদ। সমস্যা হলো মেজাজ দেখাবে কার ওপর? যারা দাম বাড়ায় তাদের ক্ষমতা বেশি আর যারা কিনে খায় তাদের ক্ষমতা না থাকার মতোই। ফলে সেই পুরনো পরামর্শ আয় বুঝে ব্যয় কর, খরচের কাটছাঁট কর। কিন্তু কিছু পণ্য ও সেবা আছে যেসবের দাম বাড়লেও তাদের প্রয়োজন কমানো কঠিন। যেমন চাল, আটাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, পানি-গ্যাস, বিদ্যুৎ, বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া ইত্যাদি।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে না। তার কারণ তিনটি। প্রথমত, উৎপাদন ও পরিবহন খরচ কমাতে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম কমানো দরকার। সরকার সেটি করবে না। দ্বিতীয়ত, আমদানি বাড়িয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো দরকার; কিন্তু মার্কিন ডলারের সংকটের কারণে আমদানির জন্য ব্যবসায়ীরা সহজে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে পারছেন না। তৃতীয়ত, কিছু কিছু পণ্যে উচ্চহারে শুল্ক-কর রয়েছে। সেখানেও ছাড় দেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ নয়। কারণ, সরকার ইতিমধ্যেই রাজস্ব ঘাটতিতে রয়েছে। ফলে জনগণকেই মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বহন করতে হবে।

২০২৪ সালের শুরু থেকেই কিছু কিছু পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে। টিসিবির হিসাবে ঢাকা বাজারে ৮ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোটা চাল, প্যাকেটজাত আটা, ময়দা, মসুর ও মুগ ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ ৪ ধরনের মসলা ও ব্রয়লার মুরগি এই ১৩টি পণ্যের দাম বেড়েছে। কোনো ক্ষেত্রে ২ টাকা, কোনো ক্ষেত্রে ৫০ টাকা। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাব বলছে, ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকার বাজারে চিনির কেজিপ্রতি দর ছিল ৪৮ থেকে ৫৫ টাকা। এখন যা ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা। শুধু চিনি নয়; চাল, ডাল, আটা, ভোজ্যতেল, মসলাজাতীয় পণ্য,

দুধ-ডিম, মাংস, সাবান-টুথপেস্ট প্রায় সব পণ্যের দাম বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি উঠেছে ১০ শতাংশের কাছাকাছিতে। এই হিসাব করা হয় ৭২২টি পণ্যের ওপর ভিত্তি করে, যদি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য প্রধান ৩৭ থেকে ৪০টি পণ্যের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হতো তাহলে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই। যে কারণেই নিম্নবিত্তের কষ্ট আর মধ্যবিত্তের হাঁসফাঁস বেড়েছে। সাধারণ মানুষ কেমন আছেন জানতে চাইলে বলেন, ভালো আছি কিন্তু এই কথাটার মধ্যে মিশে থাকছে গতানুগতিক উত্তর, প্রয়োজনীয় মিথ্যা এবং অন্যের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়।

নতুনরূপে আসা পুরনো সরকার বিশেষ কোনো উদ্যোগ না নিলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। কেউ কেউ আবার সরকারের অতীত কাজের মূল্যায়ন করে বলেন, এই সরকারের পক্ষে দাম কমানো কখনোই সম্ভব হবে না। সরকার চাইলে মূল্যবৃদ্ধি, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ছিল। আমদানি পণ্যের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার একটা বিষয়, কিন্তু ডলারের মূল্যবৃদ্ধির চেয়েও দেশের বাজারে দাম কেন বেশি বেড়েছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এর ফলে অতিরিক্ত দাম বাড়িয়ে বাড়তি মুনাফা করার সুযোগ পাচ্ছেন বড় ব্যবসায়ীরা। গম, ভোজ্য তেল-চিনি, ছোলা-খিজুরসহ বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে। দেশে মূল্যস্ফীতি বেশি, রিজার্ভ সংকট, ডলার সংকট চলছে। এর অজুহাতে কিছু পণ্যের বিশ্ববাজারে দাম কমলেও দেশের মানুষ তার সুফল তেমন একটা পাচ্ছে না।

অজুহাতসর্বস্ব সরকার আর জবাবদিহিহীন সংসদ যে কত সংকট বাড়িয়ে তোলে তার অন্যতম উদাহরণ এখন বাংলাদেশ। নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে ২০২০ সালের প্রথম দিকে। তখন অজুহাত ছিল করোনার এবং বিশ্ববাজারের। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্ব পায়নি। করোনাকালের অবসান হলো কিন্তু কমল না দাম। এরপর যখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার শক্তিশালী অজুহাত এলো তখনো তুলনা করা হলো না অন্যান্য দেশ বা বাস্তব পরিস্থিতির। এ সময়ে একদিকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমতে থাকল, অন্যদিকে দ্রুতগতিতে আরও বাড়তে থাকে ডলারের দাম। এর প্রভাব পড়ল প্রায় সব আমদানি পণ্যের দামে কিন্তু দেশীয় পণ্যের দাম কেন আকাশচুম্বী হলো তার যুক্তিসংগত উত্তর নেই। এই সময়কালে আবার সরকারও সার-বিদ্যুৎ, গ্যাস-জ্বালানি তেল ও পানির দাম দফায় দফায় বাড়ানোর ফলে দাম

বাড়ানোর পক্ষে অজুহাত শক্তিশালী হয়েছে।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি অংশীজনদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন। সরবরাহ ব্যবস্থায় যাতে কোনো ধরনের ঘাটতি না থাকে, সেটি নিশ্চিত করাই হবে তার প্রধান কাজ। উৎপাদন ও ভোক্তাপর্যায়ের মধ্যে দামের পার্থক্য যৌক্তিক রাখা, মজুদদারি রোধ, প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন তিনি। তিনি আরও বলেছিলেন, তার প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো পবিত্র রমজান মাসে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা। মানুষ শুনছে কিন্তু আস্থা পায়নি এবং দেখছে রমজানের আগেই কীভাবে দাম বাড়ছে। রোজার সময় সাধারণত ভোজ্য তেল, চিনি-ছোলা, মটর ডাল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ ও খিজুরের চাহিদা বেশি থাকে। এসব পণ্যের বেশির ভাগের চাহিদা মেটে আমদানি করে। ব্যবসায়ীদের মতে, রোজায় ভোজ্য তেলের চাহিদা অন্তত সাড়ে তিন লাখ টন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক করছাড় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সয়াবিন ও পাম তেলে কেজিতে সাত থেকে আট টাকা শুল্ক-কর কমবে। চাল আমদানিতে প্রতি কেজিতে শুল্ক কমবে সাড়ে ২৩ টাকা। এ ছাড়া কার্টনে আনা সাধারণ মানের খিজুরের কেজিতে শুল্ক কমবে ৩৩ টাকা। সবচেয়ে কম, মানে কেজিতে ৭৫ পয়সা শুল্ক কমবে চিনিতে। অতীত অভিজ্ঞতা বলে শুল্ক কমালে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ বাড়ে কিন্তু বাজারে দাম কমে না।

চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি করা সত্ত্বেও বগুড়া ও কুষ্টিয়ার পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা বলেন, সেখানকার আড়তে চালের দাম বাড়তি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চালকল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অটো, মেজর ও হাসকিং মিল মালিক সমিতির কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জানান, কয়েকদিনে চালের দাম কেজিপ্রতি দুই থেকে আড়াই টাকা বেড়েছে। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবে রাজধানীর বাজারেও পড়েছে। চালের মধ্যে মাঝারি বিআর-২৮ জাতের দাম কেজিতে তিন টাকার মতো বেড়েছে। অন্য চালের দাম কিছুটা বেড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে যে মোটা চালের (স্বর্ণা ও চায়না ইরি) কেজি ৫০-৫২ টাকা ছিল, তা এখন কিনতে হচ্ছে ৫৪-৫৫ টাকায়। মাঝারি মানের চালের (পাইজাম ও বিআর-২৮) কেজি ৫৫-৫৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০-৬২ টাকা। আর মিনিকেট ও নাজিরশাইলের মতো সর্ব চাল ৬২-৭৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬৮ থেকে ৮০ টাকা হয়েছে। ইতিমধ্যে তেলের দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত পেয়ে গেছেন বিক্রেতারা। প্যাকেটজাত মসলার দামও বাড়তি।

মাঝেমধ্যে একটু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও গরুর মাংস এখন বিলাসী খাদ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। অনেক বাগবিতণ্ডার পর ডিসেম্বর মাসের শুরুতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠকে গরুর মাংসের দাম কেজিপ্রতি ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাজারে সেই দামে বিক্রি শুরু হয়েছিল। নির্বাচন শেষ, এখন বাজারে গরুর মাংস ৭০০ টাকা কেজির বেশি দরে বিক্রি শুরু হয়েছে।

প্রতিবছর শীত শুরু হলে মৌসুমি সবজি, পেঁয়াজ, আলুসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম কমে। ব্যবসায়ীরা বলেন, এবার দর গত বছরের মতো কমেনি। সে ক্ষেত্রে আলুর পাশাপাশি পেঁয়াজের উদাহরণও সামনে আসছে। গত বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পেঁয়াজের কেজি ছিল ৩০ থেকে ৪৫ টাকা। এখন ৮০ থেকে ১০০ টাকা। শীতকাল শেষ হয়ে গেল, কিন্তু শীতের সবজির দাম কমেনি। কারওয়ান বাজারের সবজির আড়তদাররাও বলেন, সবজির দাম গত বছরের শীতের চেয়ে অনেক বেশি। সব খরচই বেড়ে গেছে। এ কারণে কম দামে বিক্রি করা যাচ্ছে না। এই যে বলা হয় সব খরচ, এই বিষয়টা দেখার কি কারও দায়িত্ব আছে?

নির্বাচনের আগেই সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানির দাম সমন্বয়ের (পড়তে হবে দাম বাড়ানোর) ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। যা ইতিমধ্যে কার্যকর হতে শুরু করেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শেষে তখনকার পরিকল্পনামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সরকার ভর্তুকির ধারণা থেকে সরে আসতে চায়। শুরুতে বিদ্যুৎ ও পানিতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হবে। এর সহজ অর্থ, দাম বাড়ানো হবে। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে নেওয়া ঋণের শর্ত মানতে জ্বালানি তেলের দাম গত সেপ্টেম্বরে বাজারভিত্তিক করার কথা ছিল। সে জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারণের সূত্রও ঠিক করে রেখেছে মন্ত্রণালয়। ভোটের আগে তা কার্যকর হয়নি, এখন তো আর বাধা নেই। ফলে দাম বাড়ানোর আর বাকি থাকবে কী? তাহলে সাধারণ সীমিত আয়ের মানুষ কী করবে? আয় যেহেতু বাড়ছে না তাহলে একটাই পথ, জীবনের প্রয়োজনের তালিকা ছোট করতে থাক। ক্ষমতাসীনরা বলেন, বাজারে জিনিস আছে, কেউ না খেয়ে মরছে না আর মানুষ ভাবতে থাকবে প্রয়োজনের তালিকা থেকে কোনটা কাটবে আর কোন প্রয়োজনকে ছেঁটে ফেলবে। বাজার অর্থনীতি যত শক্তিশালী হচ্ছে ততই যেন সাধারণ মানুষের বাজার করার ক্ষমতাই দিচ্ছে কমিয়ে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধারাবাহিক আন্দোলন ও বিদেশি চাপে বারবার সংশোধন করা হলেও তা কোনও ক্রমেই গণতান্ত্রিক শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার আইন হয়নি। সরকার এবং মালিকপক্ষ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেই চলছে। এখনও তা আইএলও ৮৭ ও ৯৮ ধারা পরিপন্থি। শ্রমিকের সংজ্ঞা, শ্রম আইনের ২০, ২৩ (ঘ), (ছ), ২৬, ২৭, ১৮০, ধারা, ঠিকাদারি ও আউটসোর্সিং প্রথা, অবহেলাজনিত মৃত্যুতে লঘু শাস্তি ও অপরাধী ক্ষতিপূরণসহ নানা বিষয়ে সংশোধনী ও নতুন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভাকে পাশ কাটিয়ে, সেখানকার সুপারিশ বাদ দিয়ে নতুন নতুন কূট-কৌশলে অগণতান্ত্রিক ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কষাঘাতে শ্রমজীবীসহ দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ দিশেহারা। বাজার নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের আর্মি রেটে রেশনের

দাবি দীর্ঘদিনের। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন বিশেষ করে গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতন অনেকটা দাস যুগের মতোই আছে। সম্প্রতি ঢাকার মোহাম্মদপুরে গৃহশ্রমিক প্রীতি উরাংয়ের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার সৃষ্ট তদন্ত ও বিচারও দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ শ্রম আইন সংশোধনে শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও আর্মি রেটে রেশন প্রদানসহ শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবি মেনে নেওয়া আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, পল্টন ও সেগুনবাগিচা প্রদক্ষিণ করে সংগঠন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

উল্লিখিত দাবিতে ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পান-চাষিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পূর্ববাসনের দাবিতে ১০ মার্চ বাসদ এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে পান-চাষিদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শফিউর রহমান শফি, জেলার সদস্য টুটুল আলী, সাঈদ আহমেদ লালন ও বিজেএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান ফিরোজ।



নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই শক্তিশালী করুন

১১ পৃষ্ঠার পর

সংবিধান হয়েছে তা নতুন সমাজ এনেছে, গণতন্ত্র এসেছে। সেখানে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে নারীদের চিন্তাচেতনায় একটা পরিবর্তন এসেছে। নারীরাও



সকল রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে পুরুষের সাথে সমানে সমান লড়াই করেছে কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর সাংবিধানিকভাবে নারীদের প্রাধান্য দেয়া হলেও এখনও তা পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় নাই।

জনযুদ্ধে নারীরা যে বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে সেটা নারীদের সম্পর্কে অনেক ধারণা বদলে দিয়েছে। তারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, অস্ত্র চালিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে, মিশন পরিচালনা করেছে। হাজার হাজার নারীকে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে হত্যা-ধর্ষণ, গুম করা হয়েছে। সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে নারীরা বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছে। এর মধ্যদিয়ে নারীদের সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়ন হয়েছে। নারীরা মায়ের জাত একথা সত্য কিন্তু দেশের প্রয়োজন হলে নারীরা মরতেও ভয় পায় না। সেটা জনযুদ্ধের মধ্যদিয়ে সেখানে তারা প্রমাণ করেছে। মজুরি বৈষম্য, পারিবারিক এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য লড়াইতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সে লড়াইয়ে কৃষক-

শ্রমিক, মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা—সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় যে বেড়া জাল তা ছিন্ন করতে হবে। নেপালে যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ধরনের জাতিসত্তা তাদের অধিকারের জন্য আমরা আন্দোলন করছি। একটা ধারাবাহিক সংগ্রামের ফল হিসেবে আজকে জাতীয় এবং প্রাদেশিক সংসদের ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি আছেন।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় সরকারে ৪০ শতাংশ নারী নির্বাচিত হয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই সংগ্রামকে তারা আরও এগিয়ে নিতে চায়। তিনি সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এবং বাংলাদেশে যারা নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন তাদের জন্য শুভ কামনা করছেন।

কমরেড চন্দ্রাশ্রিতা চৌধুরী বলেন, ফিলিস্তিনের নারী-শিশুর উপর যে অমানবিক আক্রমণ চলছে তাদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর ধিক্কার জানানো উচিত। আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজকে দেশে দেশে ধর্মীয়



বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, উসকাচ্ছে, মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নারীমুক্তির সামনে মৌলবাদ একটা বাধা। ভারতবর্ষেও একই চিত্র; এখানে একটা ফ্যাসিস্ট-মৌলবাদী, অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়

আছে। সেখানে মহিলারা মৌলবাদের আক্রমণে আক্রান্ত। আজকে সংবিধানকে পরিবর্তন করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সেখানে হিন্দু ভাবধারা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে মেয়েরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, ভোটাধিকারের জন্য, শিক্ষার জন্য তারা লড়াই করেছিল। তারা স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে অধিকার অর্জন করেছিল। ২০১২ সালে দিল্লিতে চলন্ত বাসে এক মেডিক্যাল ছাত্রীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে পুরো ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে যা নির্ভয়া নামে পরিচিতি পেয়েছিল—আর চাঞ্চল্যকর সেই মামলার পর ভারতে বদলে গিয়েছিল ধর্ষণের সংজ্ঞা ও শাস্তি। এখন আমাদের ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমরা ইতিহাসের চাকাকে সামনে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের লড়াইকে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস ও মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না; লড়াইকে আরও সামনে মানবমুক্তির জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। মহিলাদের স্বাধীনতার বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে, শ্রেণি সংগ্রামের বিষয়টাকে সামনে আনতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে যখন কোন আন্দোলন হয় তখন পশ্চিম বঙ্গের গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল মানুষও সংহতি জানিয়ে রাষ্ট্রায় নামে। আপনাদের সাথে আমাদের একটা মৈত্রী ও সম্প্রীতির সম্পর্ক আছে। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে। নারীমুক্তির আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক!

কমরেড বি আর কল্পনা মধুভাষিণী বলেন, শুধু নারী দিবসের আনুষ্ঠানিকতা নয় আমরা বাংলাদেশে একত্রিত হয়েছি একটা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য থেকে। আজকে বিশ্বব্যাপী মানুষের যে দুর্ভোগ এটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নিয়মাবলির সৃষ্ট ফল। শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হওয়ার পর যারা সেখানে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয় তারা পালাক্রমে

জনগণের উপর শোষণ-লুটপাট চালায়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে এবং জনগণের বিক্ষোভের মুখে রাষ্ট্রপতি রাজাপাকশে গদি ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু জনগণের সঠিক রাজনৈতিক শক্তি সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে না পারার দুর্বলতায় পরবর্তীতে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। একটা সমতার সমাজ গড়তে হলে নারী-পুরুষের মুক্তির জন্য নতুন ধরনের সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত



করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখল করতে হবে। শ্রীলঙ্কায়ও নারীরা জেগে উঠেছে এবং তারা ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে যুক্ত হচ্ছে। এই সংগ্রামে পুরুষরা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোগী হবে।

তিনি বলেন, ইসরায়েল যে গণহত্যা চালাচ্ছে তার নিন্দা জানাই এবং এর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনে যে নারী-পুরুষ লড়াই করেছে তাদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাই। আফগানিস্তানে নারীদের অধিকার সংকুচিত হচ্ছে, সেখানে নারীরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার প্রতি সংহতি জানাই একই সাথে বিশ্বের দেশে দেশে নারীরা যে সংগ্রাম করছে তার প্রতিও সংহতি জানাই। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও শুভকামনা জানান।

বিজ্ঞান হোক সকল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার



বিজ্ঞান হোক সকল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে 'বিজ্ঞান উৎসব-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান উৎসবে ছিল বাঙালি বিজ্ঞানীদের (জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জামাল নজরুল ইসলাম) উপর কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানবিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হাকিম বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রুহুল আমিন ও বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু। সভা পরিচালনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার সংগঠক গোলাম পারভেজ।

মুকসুদপুর মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি



গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষণের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, ছাত্র ফ্রন্ট ও বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে মুকসুদপুর সরকারি কলেজে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত। মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মাহমুদা হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ ফরিদপুর অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোসাদ্দেদ হোসেন ঢালী, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের ফরিদপুর জেলার আহ্বায়ক সজল বাউসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বেশিরভাগ শ্রমজীবী পরিবার অর্থিক অনটনের কারণে সন্তানদের

মাদ্রাসায় পড়তে পাঠান। কিন্তু সেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় বিকৃত মানসিকতার শিক্ষক দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাকে পুঁজি করে দিনের পর দিন শিক্ষকরা বিকৃত রুচির চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে, যার বেশিরভাগ প্রকাশ হচ্ছে না এবং ঘটনার বিচার বা শাস্তি পরিলক্ষিত হয় না। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই বিকৃত রুচির শিক্ষকদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। গণতন্ত্র ও বিচার হীনতার কারণে সমাজে নারী-শিশুনির্যাতন বেড়েই চলছে।

উত্তাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলনের চাপে ধর্ষক ছাত্রলীগ নেতা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত

৩ ফেব্রুয়ারি '২৪ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান ও মামুনের রশীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলের একটি কক্ষে স্বামীকে আটকে রেখে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানাজানি হলে ওই রাতেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরা মিছিলের ডাক দেয় এবং মিছিল করে মীর মশাররফ হোসেন হলের সামনে অবস্থান নেয়। এরই মধ্যে হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের প্রচলন সহযোগিতায় ধর্ষক মোস্তাফিজ হল থেকে পলায়ন করে। সেই রাতেই আন্দোলনকারীদের চাপে ধর্ষকদের সহায়তাকারী তিনজনকে প্রশাসন পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন পরবর্তীতে একটি ধারাবাহিক আন্দোলনে রূপ নেয়। পরদিনও শিক্ষার্থীদের ডাকে শত শত শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে একটি মশাল মিছিল হয়। গড়ে ওঠে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম 'নিপীড়ন

বিরোধী মঞ্চ'। আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। 'নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চ' এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রত্যেক হলে হলে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসীদের নানা অপরাধমূলক তৎপরতা চলছে। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের দখলদারত্বে টিকে আছে গণরুম সেখানে র্যাগিং এর নামে চলে ছাত্র নির্যাতন। হলে হলে ছাত্রলীগের বেপরোয়া মাদকের ব্যবসা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নাকের ডগায় ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এই পরিস্থিতি চালিয়ে আসছে। তাই আন্দোলন এই সন্ত্রাস-দখলদারত্বের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয়।

'নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চ'র পক্ষ থেকে পাঁচটি দাবি তোলা হয়, যেগুলো হলো :

১. ধর্ষক ও তার সহায়তাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. মেয়াদোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে গণরুম বিলুপ্তপূর্বক নিয়মিত শিক্ষার্থীদের আবাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং র্যাগিং-এর

সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৩. নিপীড়ক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান জনির (ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস শাখার সাবেক সভাপতি) বিচার নিষ্পত্তি করাসহ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৪. নিপীড়কদের সহায়তাকারী প্রক্টর ও মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রভোস্টের অপরাধ তদন্ত করতে হবে এবং সৃষ্ট তদন্তের স্বার্থে তদন্ত চলাকালে তাদেরকে প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে।

৫. মাদক সিডিকেট চিহ্নিত করে, জড়িতদের ক্যাম্পাস থেকে অব্যাহতি ঘোষণাপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রায় দেড় মাস ধরে 'নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চ' এর এই পাঁচ দফার ভিত্তিতে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এই দাবিগুলোতে প্রশাসনিক ভবন অবরোধসহ

নানা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি, বাকুবি শাখা, ইডেন কলেজ শাখাসহ বিভিন্ন শাখা এই ধর্ষণের বিচারের দাবিতে কর্মসূচি পালন করে। উল্লেখ্য সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম খুলনা, বিনাইদহ, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন জেলায় একই দাবিতে কর্মসূচি পালন করে। আন্দোলনের চাপে ধর্ষক মোস্তাফিজসহ ছাত্রলীগের ধর্ষককারী ও সহযোগিতাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে এবং তাদের সনদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। গত ২০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিপীড়ক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান জনিকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দাবিগুলোতে এখনও আন্দোলন চলমান আছে। অন্যায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ-আন্দোলনই যে একমাত্র পরিত্রাণের পথ জাহাঙ্গীরনগরের চলমান আন্দোলন আবারও সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চ'-এর প্রতিবাদ বিক্ষোভ



১৭ ফেব্রুয়ারি '২৪ সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও ছাত্র ফ্রন্ট খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।



৬ ফেব্রুয়ারি '২৪ ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে কলেজের অভিটোরিয়ামের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আয়োজন : দাগনভূঞা

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মহান একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দাগনভূঞা উপজেলা শাখার আয়োজনে স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আতাতুর্ক মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪টি গ্রুপে উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

দাগনভূঞা উপজেলা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি রাজু ভৌমিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দিপংকর দাসের সঞ্চালনায় আয়োজন তত্ত্বাবধান করেন সংগঠনের উপদেষ্টা হারাদন চক্রবর্তী, ফেনী জেলার সভাপতি অর্জুন দাস ও সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল মামুন। বিচারকমণ্ডলীর

দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিল্পকলার সাধারণ সম্পাদক বিজন বিহারী ভৌমিক, দাগনভূঞা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র সিকদার, চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল দাস, সহকারী শিক্ষক পলাশ দাস, হাজিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল গাফফার রোমন, করিমউল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুইটি রাণী কুরী, আতাতুর্ক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহীদ সরোয়ারী ফিরোজ, উজ্জিবক আর্ট স্কুলের প্রশিক্ষক গিয়াস উদ্দিন, ফকিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সালমা আক্তার কলি প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় ৫৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।



ঋণ খেলাপিদের তালিকা, অর্থ পাচারের অনুসন্ধান ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত এবং শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবি নেতা ডা. সাজেদুল হক রুবেল।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, লুটেরাদের প্রশ্রয় দিয়ে ব্যক্তিখাত গড়ে তোলা যায় না। এটা স্বজন তোষণমূলক পুঁজিবাদ, এটা শাসক দলের ব্যক্তিখাত। শাসকদল পরিবর্তিত হলে এরাও পরিবর্তিত হয়। খেলাপি ঋণ কম দেখানোর জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়, এতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় না। খেলাপি ঋণ বেড়ে চলে, চলছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত শত্রুদের আড়াল করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঋণ খেলাপিদের শক্তির উৎস ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল। খেলাপি ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং এদের বিদ্যুৎ, পানির লাইন কেটে দেওয়ার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনার দায় বাংলাদেশ ব্যাংক এড়িয়ে যেতে পারে না। দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং এই প্রতিষ্ঠান দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতির তত্ত্বাবধায়ক। এখন ব্যাংক খাত দলীয় সরকারের ইচ্ছার অধীনে পরিচালিত হয়। ব্যাংকের তথ্য উন্মুক্ত ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায় ও পাচারের টাকা ফেরত আনতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং খেলাপিদের তালিকা ও ঋণ অনুমোদনের সাথে জড়িতদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬ লাখ ১৭ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা এর মধ্যে এক লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা বা ৯ শতাংশই খেলাপি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছিলেন, আর এক টাকাও খেলাপি ঋণ বাড়বে

না। বাস্তবে তার কথার বিপরিত চিত্র দেখা গেছে; খেলাপি ঋণের পরিমাণ না কমে এক বছরে বেড়ে দাঁড়িয়ে ২০ দশমিক ৭০ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে ৬৫ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা খেলাপি; খেলাপির এই হার ২১ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, ঋণ অবলোপন, পুনঃতফসিল, উচ্চ আদালতে মামলার কারণে খেলাপি না দেখানো ও ঋণ পুনর্গঠন মিলিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি। কাদের প্রশ্নে খেলাপি এবং অর্থ-পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। দেশের মানুষ জানতে চায়? ‘আমি আর ডার্মি’র নির্বাচনের পার্লামেন্ট জনগণের পার্লামেন্ট নয়, এটা লুটেরা ব্যবসায়ী ও একদলীয় কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাসীনদের ক্লাব। দ্বাদশ সংসদে ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১৯৯ জন যা মোট সাংসদের ৬৭ শতাংশ আর মাত্র ২৬ জন রাজনীতিবিদ। তাই এই সংসদে জনগণের কথা আলোচনা হবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এই অবস্থান হলো জনগণের পার্লামেন্ট, এখানে জনগণের কথা বলা হলো। এরপর দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামনে অবস্থান করা হবে। সেখানেও জনগণের সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শুধু লুটেরাদের পাহারাদার নয়, এরা এই লুটের অংশীদার। এদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম গড়ে তুলে মুক্ত বাজারের অর্থনীতি বিদায় করে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বেনামে ঋণের সাথে যুক্ত ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। পাচারের টাকা ও খেলাপি টাকা উদ্ধার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার এবং লুটেরা শাসকদের বিরুদ্ধে বিকল্প শক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশের তথাকথিত শিল্পপতিরা এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলে, ব্যবসা

পরিচালনা না করে সে টাকা মেরে দিয়েছে, বিদেশে পাচার করেছে। এরা বেনামি ও প্রতারণাপূর্ণ ঋণ নিচ্ছে। আমরা যখন টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছিলাম বিগত অর্থমন্ত্রী বললেন, কারা টাকা পাচার করেছে তালিকা দিলে ব্যবস্থা নেবো। আপনারা পাচারকারীদের তালিকা দিন। অর্থপাচার আমি করি না, কারা পাচার করেছে তালিকা না দিলে জানবো কীভাবে? আমাদের প্রশ্ন, দায়িত্বে থেকে মন্ত্রী আমাদের কাছে তালিকা চাচ্ছে! সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন কানাডার ‘বেগম পাড়া’ প্রসঙ্গে বলেন, ‘কানাডায় খবর নিয়েছি, প্রাথমিকভাবে কিছু সত্যতা পেয়েছি। তাতে রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন। অবৈধভাবে পাচার করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা দেশবাসী জানে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গড়ে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৫ সালে পাচার হয়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি। আমরা দেশবাসী আশাবাদী হয়েছিলাম ২০০৮ সালের পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বিএনপির আমলে আরাফাত রহমান কোকো-র পাচারকৃত ৩৯ কোটি টাকা ফেরত এনেছিল, এই ধারাবাহিকতায় পাচারকৃত সব টাকা হয়ত দেশে ফেরত আনা হবে কিন্তু না আওয়ামী লীগের দলীয় লোকদের, ব্যবসায়ীদের পাচারকৃত টাকা ফেরত আনা হলো না। এই সরকার হচ্ছে ঋণখেলাপি, টাকা পাচারকারীদের পাহারাদার, এই সরকার সিডিকেট ও লুটপাটকারীদের পাহাদার অংশীদার, আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা। এই সরকারকে গদি থেকে উৎখাত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ লুটপাট হয়ে যায়। ব্যাংক জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। এর সাথে জড়িতদের

শাস্তি হয় না বরং এরা আরও সম্মান নিয়ে বহাল তব্বিতে দেশে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিতে জড়িতদের বিষয় তদন্ত করেছে সিআইডি। তদন্তকারীদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ব্যাংকের ভেতরের একটি চক্র চুরির ঘটনায় জড়িত যারা বিদেশি হ্যাকারদের সহায়তা করেছে। এই চক্রটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অরক্ষিত করে হ্যাকিংয়ে বা অর্থ চুরিতে সহায়তা করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এদের কারও সাজা হতে আমরা দেখলাম না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আর্থিকসহ নানা ধরনের অপরাধের সাথে যুক্তরা সেগুলো লুকানোর জন্য, কর ফাঁকি দেয়া, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার আইন ও বিনিয়োগ নীতি লঙ্ঘন, অন্য দেশে নিরাপদ বিনিয়োগ এবং উন্নত দেশের উঁচু মানের জীবনযাত্রার লোভে এবং নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার করে।

নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিবাজ ব্যাংক পরিচালকদের অপসারণের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং পুরস্কৃত করেছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মুক্তবাজারের ধারা অব্যাহত রেখে সংকট সমাধান হবে না। আর্থিক খাতে অব্যবস্থাপনা দূর না করতে পারলে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, লুটপাট-দুর্নীতি দূর করা যাবে না। তাই এসকল অনিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ব্যাংকগুলোতে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা আছে। এমন কোনো ব্যাংক খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখান থেকে টাকা লুটপাট হয়নি। অথচ অনেকে ধরাছোয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। এরা বেগম পাড়া, সেকেন্ড হোম গড়ে তুলেছে। ব্যাংকের টাকা যারা লুট করে খায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না অথচ শ্রমিকরা আন্দোলন করলে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

জিকে সেচপ্রকল্পের পানি সরবরাহ নিশ্চিত কর, কৃষি ফসলের লাভজনক দাম চাই

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিশেহারা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাজারে সিডিকেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা নিয়ন্ত্রণ হবে বলে মানুষ মনে করে না। সরকারের উন্নয়নের ঢাকের শব্দের নিচে জনগণের দুর্দশার কান্না চাপা পড়ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে, মার্চ মাস থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তেলের দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। রোজাকে সামনে রেখে প্রায় সমস্ত পণ্যের দামই বাড়ছে। সবমিলিয়ে দেশ এখন সর্বগ্রাসী সংকটে নিমজ্জিত। এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ এবং কৃষক ও খেতমজুরেরা।

বীজ-সার, সেচ-ডিজেল, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অথচ কৃষক লাভজনক দামে ফসল বিক্রি করতে পারছে না। ফলে মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষকে এবং প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। এদের আয় না বাড়লেও ব্যয় বেড়েই চলেছে। মধ্যস্বত্বভোগী, ফড়িয়া, দালাল ও সিডিকেটের দৌরাত্ম্যে লাভজনক দামতো দূরের কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষক উৎপাদন খরচও তুলতে পারে না। অথচ ভোক্তারা বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রামে যুবকরা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত,

কৃষক পরিবার তাদের সামান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি, বন্দক রেখে, ধারদেনা করে কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের বিদেশে পাঠাতে গিয়ে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছে। সাগরে ডুবে এবং জঙ্গলে বেঘোরে মৃত্যুবরণ করছে। বেকার জনগোষ্ঠী মাদকাসক্তিসহ নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে। অথচ সরকার নতুন শিল্প-কারখানা নির্মাণ না করে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও দেশি-বিদেশি লুটেরাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পাটকল, চিনিকল বন্ধ করেছে।

এ অবস্থার কবল থেকে কৃষি-কৃষক, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষসহ দেশ বাঁচাতে নিম্নোক্ত দাবি আদায়ে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই, দুর্বীর কৃষক-গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দাবিসমূহ—

- সার-বীজ, ডিজেল-বিদ্যুৎ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম কমাও। বিএডিসিকে সম্পূর্ণ সচল করে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ পর্যাণ্ড পরিমাণে যথা সময়ে খোদ কৃষকের কাছে সরবরাহ কর।

- খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খোদ কৃষকের কাছ থেকে-সরকারি উদ্যোগে হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে উৎপাদন খরচের চেয়ে ৪০ শতাংশ লাভজনক দামে ফসল কিনতে হবে; মৌসুমে কমপক্ষে ৫০ লাখ টন ধান কিনতে হবে।

- কৃষকদের সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ দাও,

সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার কর, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদ-আসলসহ মওকুফ কর।

- চালসহ নিত্যপণ্যের দাম কমাও, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, খাদ্য, চিকিৎসার নিশ্চয়তা ও আর্মি রেটে রেশন চাই।

- সেচের খরচ কমাও, প্রান্তিক চাষিদের বিনামূল্যে সেচের ব্যবস্থা কর।

- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বয়স্ক-বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, দুঃস্থদের মাসিক ভাতা প্রদান কর। টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিএফ, ভিজিডিসহ সকল ক্ষেত্রে দলীয়করণ-দুর্নীতি বন্ধ কর।

- খাসজমি, জলমহলের লিজ প্রথা বাতিল কর, ভূমিহীনদের বরাদ্দ দাও।

- বন্ধ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকল-চিনিকল আধুনিকায়ন করে চালু কর; আখচাষিদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ কর। কৃষিভিত্তিক নতুন শিল্প গড়; বেকারদের কাজ দাও, নইলে বেকার ভাতা দাও।

- পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের উপর সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ কর, সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাও। ভূমির অধিকার নিশ্চিত কর।

- সকল শ্রমজীবী ভূমিহীনদের আবাসন সংকট নিরসন কর। সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত কর।

- সাবরেজিস্ট্রি অফিস, ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, তহশিল অফিসের ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ কর।

কমরেড শিব শংকরের মৃত্যুতে শোক



সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল ১০ মার্চ এক বিবৃতিতে বগুড়া পাদুকা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও শ্রমিক ফ্রন্টের সদস্য কমরেড শিব শংকর শিবুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

তার মৃত্যুতে পাদুকা ইউনিয়ন এবং শ্রমিক ফ্রন্টের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। শ্রমিকশ্রেণি হারলো অকৃত্রিম দরদি বন্ধুকে।

শ্রম আইন সংশোধন এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শ্রম আইন সংশোধন, দ্রব্যমূল্য কমানো ও শ্রমজীবীদের জন্য আর্মিরেটে রেশনিং চালু, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে দেশব্যাপী সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি আফজাল হোসেন, সহসম্পাদক মনির হোসেন মলিন, সদস্য তনভীর নাসিম, হাবিবুর রহমান হাবিব, শরিফুল ইসলাম দিদার। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন ২০০৬ শ্রমিকসংগঠন সমূহে ও শ্রমিকদের এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১



সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সমাবেশ পরবর্তী মিছিল

খেলাপি ঋণের টাকা উদ্ধার, অর্থ পাচারকারীদের গ্রেপ্তার কর পাচারকৃত অর্থের শ্বেতপত্র প্রকাশ কর



বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে বাম জোটের বিক্ষোভ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কোটি টাকার উর্ধ্ব ঋণ খেলাপীদের তালিকা ও কীভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণ পেয়েছিল তার তথ্য প্রকাশ এবং অর্থ পাচারের অনুসন্ধান, শ্বেতপত্র প্রকাশ, পাচারের টাকা উদ্ধার ও খেলাপি ঋণ আদায়, ব্যাংক ডাকাত পাচারকারীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, দায়ীদের গ্রেপ্তার-শাস্তি, আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম দূর করার দাবি জানিয়েছেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৯

ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ও দেশের বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক অভিমুখে বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে মিছিল তোপখানা-পল্টন, মতিবিল হয়ে বাংলাদেশে ব্যাংকে গেটের সামনে গিয়ে সমাবেশ করে। জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) 'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের নেতা কমরেড আব্দুস সাত্তার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ বাসদ (মার্কসবাদী) 'র সমন্বয়ক মাসুদ এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

জিকে সেচপ্রকল্পের পানি সরবরাহ নিশ্চিত কর

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট বিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষের আর্মিরেটে রেশন দেয়া, চাল-ডাল, তেল-গ্যাস, চিনি-ওষুধসহ নিত্যপণ্যের দাম কমানো, আমি-ডামির নীতিহীন অপকৌশলের একতরফা ও প্রহসনের নির্বাচন বাতিল করে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে সৃষ্টি নির্বাচন দেওয়া, বিনাইদহের কৃষি জমিতে জিকে

সেচপ্রকল্পের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য দাবিতে সংগঠনের বিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও উজির আলী স্কুলের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফ্রন্ট বিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, ছদ্মূল হোসেন, আছাদুর রহমান, মামুন হোসেন, ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক নুসরাত জাহান সাখী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতিতে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষ এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১



‘নারীমুক্তি আন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রাম’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত



নারীর মর্যাদা, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করা, শোষণ-লাঞ্ছনা, নিপীড়ন-নির্যাতন রুখে দাঁড়ানো এবং সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই শক্তিশালী করার আহ্বান নিয়ে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ১১৪তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে ৮ মার্চ। তার ধারাবাহিকতায় ৯ মার্চ '২৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রাম' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারি

সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, জার্মানির এমএলপিডির চেয়ারউইম্যান কমরেড গাবি ফেচনার, অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ উইমেন্স এসোসিয়েশন জাতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য কমরেড মধুরিমা বকশি, অল নেপাল উইম্যান্স এসোসিয়েশন (রেভ্যুলিউশনারি) এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিমা শ্রেষ্ঠা, সোশ্যালিস্ট উইমেন্স ইউনিয়ন, শ্রীলঙ্কা-র সদস্য কমরেড বি আর কল্লনা মধুভাষিণী, মহিলা ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক মনীষা চক্রবর্তী। সমাবেশ পরিচালনা করেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নূরী।